সরল বাঙ্গালা সাহিত্য

রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, ডি, লিট,

প্রণীত

শ্রাবণ—১৩২৯।

শিশির পাবলিশিং হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীশিশির কুমার মিত্র বি, এ,

শিশির পাব্লিশিং হাউস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
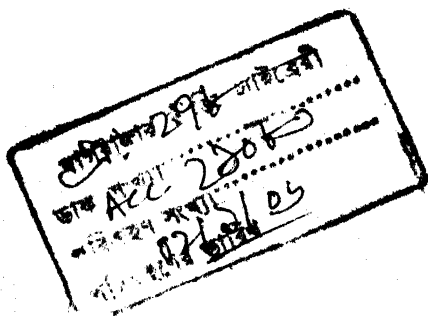
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—আবদুল গফুর

নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস,

২৪২।১, অপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা।

উৎসর্গ

বাঙ্গলা ভাষাকে

উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিতে

যে অনন্যসাধারণ কর্ম্মবীর কৃতসংকল্প,

যিনি

মহাবিপ্লবের দিনে বঙ্গদেশের বিদায়োন্মুখী

ভারতীকে 'তিষ্ঠ' বলিয়া

তাঁহার গতি অবরোধ করিয়াছেন,

সেই অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী

বঙ্গদেশের—বঙ্গ-সমাজের

মুকুটমণি

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

শ্রীকর-কমলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

ভক্তির চিহ্নস্বরূপ উপহৃত হইল।

ভূমিকা

আমার রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গালাভাষায় রচিত বইগুলি খুব বড়। তাহাতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরুপণের চেষ্টায় রচনা-পদ্ধতিটি অনেকস্থলে বালকবালিকা ও সাধারণের উপযোগী হয় নাই; এইকথা অনেকের মুখে শুনিয়াছি। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন বালকদের উপযোগী একখানি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। গল্পচ্ছলে সরল ভাষায় দেশী সাহিত্যের ইতিহাসটা তাহাদিগকে জানান দরকার,এই উদ্দেশ্যে বইখানি লিখিত হইয়াছে। তাই বলিয়া ইতিহাসের মূল কথাগুলি আমি বাদ দিই নাই। ছোট ছোট গ্রন্থকারের নাম ও তারিখাদি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু বড় জিনিষগুলির উপর দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। তাহা

ছাড়া গল্পের ভাগ বেশী দেওয়াতে ছেলেরা আমোদের সহিত বইখানির আদ্যন্ত পড়িতে পারিবে—আমার এই বিশ্বাস। বইখানি ভাল করিয়া পড়িলে বঙ্গ-ভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসটি ধারাবাহিক-রূপে জানা যাইবে।

৭ নং বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার—কলিকাতা।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।
১০ই ভাদ্র, ১৩২৯।

সূচীপত্র

সরল বাঙ্গালা সাহিত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। রাজ-সভায় বাঙ্গালা ভাষার অনাদর।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষাকে পূর্ব্বে লেখা-পড়া জানা লোকেরা গ্রাহ্য করিতেন না; তাঁরা ছিলেন মস্ত বড় সংস্কৃতের পণ্ডিত, তাঁরা রাজসভায় টীকি নাড়িয়া বড় বড় সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। বল্লালসেন নামে বাঙ্গালাদেশের বড় এক রাজা ছিলেন— তিনি 'দানসাগর' নামে মস্ত এক সংস্কৃত বই রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেনের সভায় গোবর্দ্ধন নামে এক কবি ছিলেন, তিনি সংস্কৃতে যে সকল বই লিখিতেন— তাহাতে এত লম্বা লম্বা সমাস থাকিত ও তার শব্দগুলি এত বড় হইত যে, যাঁহাদের খুব বেশী ব্যাকরণ ও

অভিধানের বিদ্যা না থাকিত, তাঁহারা সেই লেখার অর্থ বুঝিতে পারিতেন না। এই লক্ষ্মণসেনের প্রিয় কবি ছিলেন জয়দেব ; তিনিও সংস্কৃতে লিখিতেন, কিন্তু সে সংস্কৃত ছিল সহজ ও মধুর, তাঁহার গীত-গোবিন্দের নাম কি তোমরা শোন নাই ? এই পুস্তকে রাধাকৃষ্ণের নানা লীলার কথা আছে। বৈষ্ণবেরা এই বইখানি তাঁদের ধর্ম্ম-পুস্তক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। গীত-গোবিন্দের সংস্কৃত এত সহজ যে তাহার কথা এক এক সময় বাঙ্গালার মত শোনায়! "চল সখি কুঞ্জং" এই কথায় "কুঞ্জং" শব্দটির স্থানে যদি "কুঞ্জে" লেখ, তবেই ত খাটি বাঙ্গালা হইল। লক্ষ্মণসেন কখন রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা জান? এখন ইংরেজী ১৯২২ সন। লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়াছিলেন ইংরেজী ১১৬৯ সনে। সুতরাং ৭৫৩ বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালা দেশের রাজা হন। এই সময় ভারতবর্ষের উত্তরদিকটা, যাহাকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলা যায়, তাহার প্রায় সমস্তটা মুসলমানেরা আসিয়া দখল করিয়া লইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের দাড়ি গোঁপ সমস্ত যখন পাকিয়া সাদা ধব্‌ধবে হইয়া গিয়াছিল—সেই সময় বক্তিয়ার খিলিজি

নামে এক মুসলমান বীর আসিয়া বাঙ্গালা দেশে যুদ্ধের জন্য হাঁক দিলেন। বুড়ো বয়সে রাজা লক্ষ্মণসেন আর মুসলমানদের সঙ্গে ঝগড়া করিলেন না। তাহার রাজধানী ছিল নদীয়াতে। তিনি সে জায়গা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

জয়দেবের গীত-গোবিন্দ সহজ ভাষায় লেখা হইলেও তাহা সংস্কৃত ভাষা। বাঙ্গালা ভাষায় তখন কেউ বই লিখিলে রাজসভার তার আদর হওয়া দূরের কথা—পণ্ডিতেরা তাহা ঘৃণা করিতেন। বাঙ্গালা ভাষা ছিল তখন ইতরের ভাষা—তাহার স্থান ছিল পাড়াগাঁয়ে ছোটলোকদের মধ্যে এবং মেয়েদের মহলে।

২। মনসাদেবীর গান।

মেয়েরা ও ছোট লোকেরা পূজা করিত মনসা-দেবীকে; পণ্ডিতেরা সেদিক দিয়া যাইতেন না। তথাপি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোকেরা তাহাদের গ্রাম্য ভাষায় গান বাঁধিয়া মনসা দেবীর পূজার দালানে উৎসব আমোদ করিত, এই গানগুলির নাম ছিল—"ভাসান গান।" যদিও গ্রাম্য ভাষায় এগুলি লিখিত

ছিল,—এই গানের মধ্যে তবুও খুব প্রাণের কথা থাকিত। কখন কখন এই গান শুনিয়া লোকেরা না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত না।

ভাসান গানে দুইজনের কথা খুব চমৎকার করিয়া লেখা আছে, একজনের নাম চাঁদ সদাগর। মনসা দেবী সমস্ত সাপের দেবতা। কিন্তু চাঁদ সদাগর ছিলেন শিবঠাকুরের ভক্ত, তিনি কিছুতেই মনসাদেবীকে পূজা করিবেন না, এই ছিল তাঁহার পণ। এদিকে শিবের আজ্ঞা ছিল যে, চাঁদ সদাগর আগে পূজা না দিলে মনসাদেবীর পূজা জগতে প্রচারিত হইবে না। মনসাদেবী চাঁদ সদাগরকে পূজায় মত লওয়াইতে অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু চাঁদ কিছুতেই রাজি হইলেন না। দেবী রাগিয়া গিয়া চাঁদের সখের বাগানটি সাপের বিষ দিয়া পোড়াইয়া দিলেন, তারপর একে একে সদাগরের ছয়টী পুত্রকে নিহত করিলেন। কিন্তু তবুও চাঁদ তাঁহাকে পূজা করিতে স্বীকার করিলেন না, তাঁহার একটা হেঁতাল কাঠের লাঠি ছিল, তিনি সেইটি হাতে লইয়া দেবীকে মারিবার জন্য তাড়া করিয়া যাইতেন। একবার চাঁদ সাত ডিঙ্গা নানা বহুমূল্য
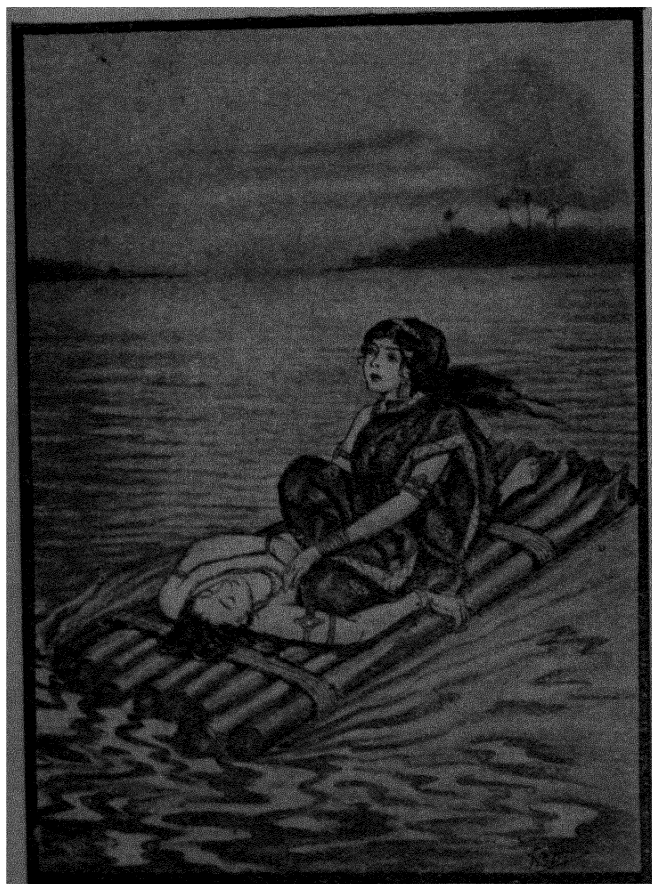
বেহুলা, লখীন্দরের মৃতদেহ ভেলার উপর—৫ পৃষ্ঠা।

সামগ্রীতে বোঝাই করিয়া বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন; দেবী ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া সমস্ত ডিঙ্গাগুলি কালী-দহের হ্রদে ডুবাইয়া দিলেন। চাঁদ সদাগর জলে ডুবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু চাঁদ মরিয়া গেলে দেবীর পূজা ত জগতে প্রচার হইবে না, এইজন্য দেবী তাঁহার সিংহাসন হইতে মস্ত বড় একটা পদ্মফুল জলে ফেলিয়া দিলেন, সেই বড় পদ্মটার উপর ভর করিয়া যেন চাঁদ জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে পারে, এই তাঁহার ইচ্ছা। মনসাদেবীর এক নাম পদ্মা। চাঁদ সেই পদ্মটা ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতে যাইয়া তাঁহার মনে পড়িল মনসাদেবীর নাম পদ্মা, সুতরাং পদ্মফুলের নামের সঙ্গে দেবীর নামের একটা মিল আছে। তখন চাঁদ ঘৃণায় হাত ফিরাইয়া লইলেন এবং জলে ডুবিয়া মরিবেন স্থির করিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলেন। এত বড় ছিল তাঁহার তেজ এবং দেবীর উপর রাগ।

তিনি মরিলেন না। তাঁহার আর একটি পরম সুন্দর পুত্র হইল। দৈবজ্ঞেরা গণিয়া বলিল,—বিবাহের রাত্রে মনসাদেবীর সাপে পুত্রটিকে কামড়াইয়া মারিবে।

চাঁদ পুত্রের বিবাহ দিলেন, কিন্তু কোনরূপে সাপ বাসরঘরে ঢুকিতে না পারে এইজন্য লোহা দিয়া সাঁতলী পর্ব্বতের উপর ঘর নির্ম্মাণ করিলেন। চারিদিকে অনেক সেপাই ও শান্ত্রী ঘরটি ঘিরিয়া রাখিল। শত শত ওঝা নানারূপ ঔষধ সেই বাসর-ঘরের চারিদিকে পুঁতিয়া রাখিল, যাহাতে সাপ সেই গন্ধে ঘরের কাছে না আসিতে পারে। সদাগর শত শত বেঁজী ও ময়ুর বাসর ঘরের আশে পাশে ছাড়িয়া দিলেন, বেঁজীগুলি থাবা তুলিয়া বসিয়া রহিল ও ময়ুরেরা পেখম ধরিয়া সাপ মারিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

কিন্তু তবুও চাঁদ তাঁহার প্রিয়তম ছেলেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। দেবতার সঙ্গে মানুষের লড়াই, এতে কি কখন জয় হইতে পারে? দেবীর সাপ কালনাগিনী একটা ছিদ্র পাইয়া ঘরে ঢুকিয়া চাঁদ বেনের ছেলে লখীন্দরকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিল।

আমি তোমাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছি ভাসান গানের দুইটি লোক বড় চমৎকার। প্রথম ব্যক্তি চাঁদ সদাগর, —দ্বিতীয়টি চাঁদের পুত্রবধূ বেহুলা। বেহুলা লাল চেলী পরিয়াছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর সে থান কাপড়

পরিল না, সে তার কপালের সিন্দুর মুছিয়া ফেলিল না, সে হাতের শাঁখা ভাঙ্গিল না, তার খোঁপা হইতে মালতী ফুলের মালা খুলিয়া ফেলিল না এবং গলার হীরার হার, হাতের অনন্ত ও কঙ্কণ এবং পায়ের নূপুর খুলিয়া সে বিধবা সাজিল না। সে একটা কলাগাছের ভেলা তৈরী করাইয়া মৃত স্বামীকে লইয়া তার উপরে উঠিল এবং গাঙ্গুড় নদীর কালো ঢেউএর উপর বিদ্যুতের মত ভেলা চালাইয়া দিয়া স্বামীকে প্রাণ দেবে—এই সংকল্প করিয়া চলিয়া গেল। নদীর দুই পারে দাঁড়াইয়া লোকেরা দেখিল—যেন সাক্ষাৎ সাবিত্রী যমরাজের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে ছুটিয়াছেন।

মনসাদেবীর কৃপায় বেহুলা স্বামীর জীবন ফিরিয়া পাইয়াছিল; শুধু তাহাই নহে, সে তাহার ছয়টি মৃত ভাসুরকেও বাঁচাইয়াছিল। তাহা ছাড়া দেবীর কৃপায় চাঁদ সদাগরের সাত ডিঙ্গা সমস্ত দ্রব্যাদি সমেত কালী-দহের জল হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু তাহার আসল বাহাদুরী, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ, তাহার শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে দিয়া সে মনসাদেবীর পূজা করাইয়াছিল।

এই হইল মনসাদেবীর গানের বিষয়। সেই পুরাণকালের ভাষা, তাহার কোন শ্রী নাই, কথার লালিত্য নাই, কিন্তু তবুও যদি বেহুলার দুঃখের কথা পড়, তবে তোমারও চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িবে। কোন সময় হইতে যে মনসাদেবীর গান রচনা হইয়া আসিতেছে তাহা বলা যায় না—আমরা এই গানের যতজন লেখকের নাম পাইতেছি, তাঁদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা পুরাতন হরিদত্ত—ইঁহার বাড়ী ছিল সম্ভবত বাখরগঞ্জ জেলায়। ইনি ইং ১২০০ সনের কাছাকাছি কোন সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়,—সুতরাং তিনি এখন হইতে ৭০০ বছর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পরে ঐ জেলায়ই ফুলশ্রী গ্রামে বৈদ্য সনাতনের পুত্র বিজয়গুপ্ত খুব বড় আর একখানি ভাসান গান রচনা করেন। যখন ইনি পুস্তক লিখেন তখন বাঙ্গালার সম্রাট ছিলেন—'হুসেন সা'। তখন ফুলশ্রী গ্রামের উত্তরে এক মহা প্রতাপশালী রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার নাম ছিল অর্জ্জুন।

বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল এতটা আদর ও সম্মান পাইয়াছিল যে ৪০০ বছর আগে রচিত হইলেও এই

বই এখনও বাঙ্গালা দেশে শত শত লোক পড়িয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন ঘরে ঘরে মনসাদেবীর পূজা হয়। নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় মনসাদেবীর পূজার মণ্ডপে মেয়ে পুরুষেরা একত্র হইয়া এই বই গানের ছন্দে পড়িয়া থাকেন। বইখানির আকার নেহাৎ ছোট নয়। তোমরা কাশীদাসী মহাভারত দেখিয়াছ, বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলের আকার প্রায় তাহার অর্দ্ধেক হইবে। ভদ্র ঘরের পুরুষ ও মেয়েরা দুইটা পৃথক জায়গায় বসিয়া যান, ইতর লোকের পুরুষ মেয়েরাও তাঁহাদিগের কাছেই বসিতে পায়। স্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে একজন বুড়া ভাল গায়ক এক ছত্র গাহিয়া দেন,—পুরুষের দল এবং পরে মেয়েরা একত্র হইয়া সেই গানের দোহারী করেন, এইভাবে গান জমিয়া উঠে। যখন বেহুলা স্বামীর মরা দেহ লইয়া গাঙ্গুড়ে ভাসিয়া যান,—তখন স্ত্রীলোক ও পুরুষ একত্র কাঁদিতে কাঁদিতে গানগুলি গাহিতে থাকেন। যাঁহারা গান করেন, তাঁহারা কাঁদেন এবং যাঁহারা শোনেন তাঁহাদেরও চোখের জল শুকাইতে পায় না। বেহুলা স্বামীর জন্য কত উপবাস করিয়াছেন,

কত ভয়ানক দুর্গমপথে চলিয়াছেন,কত দুষ্টলোকের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছেন, মেয়েরা তাহা শুনিয়া এমন একটি পবিত্র দৃষ্টান্ত পায়—যাঁহার মত হইতে তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হয়। শত শত শ্লোক মুখস্থ করিয়া যে শিক্ষা হয় না, এই গানের ভিতর দিয়া তাহা হয়। বাঙ্গালার পাড়াগাঁয়ের মেয়ের প্রাণে যে কত মমতা, তাহা এই গান শুনিলে বেশ বুঝা যায়। একটা জায়গা মনে কর,—বেহুলা যে ঘোর বিপদে পড়িয়াছে, তাহার মা বাপ নিছুনি নগরে থাকেন, কেহ সে সংবাদ ভয়ে তাঁহাদিগকে জানায় নাই, পাছে শোকে তাঁহাদের বুক ভাঙ্গিয়া যায়। পুরুষ দলের এক ভদ্র গায়ক গাহিলেন —

"ছয় মাসের দূরে যদি পুত্র মরি যায়।"

তখন প্রথমে অপরাপর পুরুষেরা তারপর মেয়েরা এই ছত্রটি দোহারী করিয়া গাহিল, তারপর পুরুষদের প্রধান গায়ক আবার গাহিলেন—

"সকলে জানিবার আগে—আগে জানে মায়॥"

এই ছত্রেরও আবার দোহারী চলিল। ছেলে যদি ছয় মাসের দূর পথে গিয়া মারা পড়ে—তবে মায়ের মন

তা টের পায়। তোমরা তোমাদের মায়ের কথা মনে করিয়া এই ছত্র দুইটি পড়, তোমাদের প্রাণে মায়ের স্নেহের বেদনা একটা সাড়া দিয়া উঠিবে।

বিজয় গুপ্ত যখন বাখরগঞ্জের ফুলশ্রী গ্রামে বসিয়া বাঁশের কলম দিয়া তুলট কাগজের উপর এই কাব্য রচনা করিতেছিলেন, প্রায় সেই সময়ে ময়মনসিংহ জেলায় বুড় গ্রামে নারায়ণ দেব আর একখানি মনসা-মঙ্গল লিখিয়াছিলেন। নারায়ণ দেবের জন্মস্থান ছিল মগধ এবং তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। প্রায় ৪৫০ বৎসর হইল তাঁহার কাব্যখানি লেখা হইয়াছিল। বেহুলার কথা তিনিও লিখিয়াছেন। তিনি চোখের জল বাম হাতে মুছিতে মুছিতে ডান হাত দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—বেহুলা স্বামীকে মৃত দেখিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন,—

> "অমৃত সমান রে' প্রভু তোমার মুখের বাণী।
> পুনরপি না শুনিলুম মুই অভাগিনী॥
>
> হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কঙ্কণ করিমু চুর।
> মুছিয়া ফেলিমু আমি সিঁথির সিন্দুর॥

এ হেন সুন্দর রূপ প্রভু রে প্রকাশিত রজনী।
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া রূপ হরিল নাগিনী ॥

চাপার কলিকা সম প্রভু রে
তোমার কোমল অঙ্গুলি।
তুমি আমার প্রভু রে, অভাগী বেহুলা ডাকে,
চাহ চক্ষু মেলি ॥"

এই লেখার ভাষা আর পাড়াগাঁয়ের ভাষার মত এলোমেলো নহে। সংস্কৃতের দীপ্তি পড়িয়া এই ভাষাকে বেশ ঝক্‌ঝকে করিয়াছে।

কিন্তু তোমরা মনে করিও না যে, মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলি কেবলই কান্নার সুরে লেখা। মেয়ে পুরুষ-দের পাশে কাহারও কোঁচা ধরিয়া, কাহারও আঁচলে ছোট দেহ জড়াইয়া যে সকল ছোট ছোট শ্রোতারা ঘুমের সঙ্গে লড়াই করিয়া রাত্রি জাগিতেছিল, তাহাদের জন্য লেখকেরা কি কিছুই দিয়া যান নাই? অবশ্যই দিয়াছেন। বাঘ, শেয়াল, কুমীর প্রভৃতি জন্তরা যখন লখীন্দরের মড়া দেহটা খাইতে আসিয়াছে, তখন তাহাদের গায়ের লোম, চোখের কটা রং ও ল্যাজ আছড়ানোর কথা

শুনিয়া ছেলেরা ভারি মজা পাইয়াছে—যেখানে গোদা, গলায় রামকড়ির মালা দোলাইয়া, সাঁচি পানে মুখ লাল করিয়া বেহুলাকে বিয়ে করিবার প্রস্তাব করিতেছে, সেখানে হঠাৎ কান্না থামিয়া গিয়া হাসির রোল পড়িয়া যাইত।

ময়মনসিংহে ইহার কিছু পরে মনসা-মঙ্গলের আরও দুইজন মস্ত বড় কবি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের এক-জন বংশীদাস, এবং অপরা বংশীর কন্যা চন্দ্রাবতী। ইঁহারা ব্রাহ্মণ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বংশীদাসের বাড়ী ছিল পাটোয়ারী গ্রামে, ফুলেশ্বরী নদীর পারে। ইহার জীবনের একটি ঘটনা তোমাদের কাছে বলিব,—একটা বড় দুর্ভাগ্য কিরূপে একটা খুব বড় রকমের সৌভাগ্যে পরিণত হইল—এটা তাহারই কথা—চাক্ষুষ ঘটনা। তাঁহার মেয়ে চন্দ্রাবতী নিজে লিখিয়াছেন।

বংশীদাস ভাসান গান গাহিয়া যে রকম নাম করিয়াছিলেন, সে রকম টাকা পয়সা করিতে পারেন নাই, বরং দীনদরিদ্র ছিলেন। একদিন তিনি দলের লোক লইয়া একখানে গান গাহিতে চলিয়াছিলেন—পথের মাঝখানে একটা বড় নল-খাগড়ার বন। প্রায়

এক দিনের পথ জুড়িয়া সেই জায়গাটা, তার নাম "জালিয়া হাওড়"। কিশোরগঞ্জে এখনও জায়গাটা আছে। সে সময় লোকে টাকা মাটীতে পুঁতিয়া রাখিত, বড়ই ডাকাতের ভয় ছিল। বংশীদাস দলবলের সঙ্গে সেই নল খাগড়ার বন দিয়া যাইতে যাইতে অস্ত্র-শস্ত্র হাতে একদল ডাকাতের হাতে পড়েন, ডাকাতের সর্দ্দার ছিল কেনারাম। এই কেনারাম এরূপ ভয়ানক লোক ছিল যে, তাহার নাম শুনিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত। বংশীদাস ও তাহার দলের লোকদের যা কিছু ছিল—তাহা কেনারাম খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিল, কিছু পাইল না, "তবু তোমাকে মারিব" বলিয়া কেনারাম বংশী-দাসের কাছে খড়্গ লইয়া যমের দূতের মত দাঁড়াইল। বংশী পৈতা দেখাইলেন। কেনারাম বলিল, "ঢের ঢের বামুন মারিয়াছি, পৈতার ভয় রাখি না।" বংশীদাস বলিলেন, "আমি নিরীহ বামুন, গান গাহিয়া বেড়াই, আমাকে মারিয়া কি লাভ করিবে, বল?" কেনারাম জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" "আমার নাম 'বংশী' আমি দেবীর ভাসান গাহিয়া কিঞ্চিৎ রোজগার করিয়া কষ্টে সৃষ্টে পরিবার প্রতিপালন করি।" কেনা-

রাম বলিল, "তুমি কি সেই বংশী যার ভাসান গান শুনে পাষাণ গলে যায়? কিন্তু পাষাণ গলাতে পার, ঠাকুর, আমার প্রাণ গলানো শক্ত, বিশেষ তুমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াও, আমাকে দেখে রাখ্‌লে—কোন দিন ধরিয়ে দেবে ঠিক কি?" সুতরাং জীবনের কোন আশা নাই, এখন প্রস্তুত হও।" বংশী অনেক অনুনয় করিলেন। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"—কিছুতেই ডাকাতের প্রাণ গলিল না। তখন বংশী শেষ এই প্রার্থনা জানাইলেন—"আমরা শেষবার মায়ের নাম গান করিব—মৃত্যুর পূর্ব্বে এই ভিক্ষা দাও।" কেনারাম গাহিতে অনুমতি দিল। চারিদিকে নল খাগড়ার বন, সেই "হাওর" হইল আসর, আকাশটা যেন একটা চান্দোয়ার মত কেউ খাটাইয়া গায়কদলের মাথার উপর রাখিয়া দিয়াছে। সম্মুখে শ্রোতারা যম দূতের ন্যায়। মৃত্যু সম্মুখে করিয়া বংশীদাস একান্ত ভক্তির সঙ্গে গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে গান আরম্ভ করিয়া দিল। সে গান এমনই চমৎকার হইল যে, যে সকল পাখীরা আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল, তাহারা যেন গানে মুগ্ধ হইয়া মাটীতে আসিয়া বসিল,

কেনারাম স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। ক্রমে লখীন্দ-রের জন্ম—লোহার বাসর—এই সমস্ত পর পর গাওয়া হইল। কিন্তু যখন বেহুলা রাঁঢ়ী হইল, গানের সেই অংশ শুনিয়া ডাকাতেরা স্তব্ধ হইয়া গেল। কেনারাম নিজেও যেন কেমন হইয়া গেল, বাঘ যেন মানুষ হইল। ইহার পরে মরা স্বামীকে বুকে লইয়া বেহুলা ভাসিয়া যাইতেছে। তখন কেনারাম আর নিজকে সম্বরণ করিতে পারিল না। বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী লিখিতেছেন—

"যখন গাহিল পিতা বেহুলা ভাসান,
হাতের খাণ্ডা ভূমে ফেলি কাঁদে কেনারাম॥"

যে বিধাতা কেনারামের মনটা পাষাণের মত শক্ত করিয়াছিলেন, তিনি আবার তাহা ফুলের মত কোমল করিয়া ফেলিলেন। এর পর আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা, —যে যার গলা খড়্গ দিয়া কাটিবে সে তার পা ধরিয়া বসিয়া আছে। কেনারামের বিপুল সম্পত্তি সে বংশীকে দিতে ইচ্ছুক হইল, কিন্তু বংশী বলিলেন, "তুমি মানুষের রক্ত দিয়া হাত রাঙ্গাইয়া যাহা পাইয়াছ, আমি

তাহার ভাগী হইতে চাই না।" কেনারাম সে সকল সঞ্চিত টাকা নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া পাপমুক্ত হইল। সে খড়্গ ফেলিয়া দিয়া হাত জোড় করিয়া বংশীদাসের পিছু পিছু গেল। কেনারামের গলাটা ছিল ভারি মিষ্ট, দস্যুর গলার মত আদবেই নয়—বরং কোকিলের মত। বংশী যখন বুড় হইলেন,তখন কেনারামই তাঁহার দলের প্রধান গায়ক হইল। সে মনসা-মঙ্গল এমন মধুর ভাবে এমন মনভুলানো ব্যথার সুরে গাহিত, যে সে আসরে দাঁড়াইবা মাত্র আসর জমিয়া যাইত।

সুতরাং ভাসান গান কেবল পুরুষ ও মেয়েদের মন মহৎভাব দিয়া ভরিয়া দিত না, শুধু শিশুদিগকে হাসাইয়া, আমোদ দিয়া সুনীতি শিখাইত না, শুধু কাব্য-কথায় করুণ রস বুঝাইয়া ক্ষান্ত থাকিত না—ইহা ডাকাতকে ধর্ম্মগুরুর আসনে বসাইত। পাড়াগেঁয়ে লোকেরা সংস্কৃত বড় বড় শাস্ত্র না জানিলেও মনসা মঙ্গল দিয়া যে শিক্ষা যে নীতি ও যে নির্ভর লাভ করিত, তাহা অবহেলার যোগ্য নহে।

হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া এখনও পূর্ব্ববঙ্গে মনসা মঙ্গল গান করিয়া থাকে। আমি মনসামঙ্গলের

কয়েকখানি পুরাতন হাতের লেখা পুঁথি পাইয়াছি—তাহা মুসলমান লেখকগণ নকল করিয়াছেন। সুতরাং এই কাব্য হিন্দু মুসলমানকে—সমস্ত বঙ্গদেশবাসীকে—এক সময়ে আনন্দ দিয়াছিল। ঢাকায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত ঝিনারদি গ্রামে ষষ্ঠীবর সেন ও গঙ্গাদাস সেন নামক সুবর্ণবণিক জাতীয় দুই কবি প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ যে ভাসান কাব্য লিখিয়াছিলেন তাহা আকারে ছোট হইলেও গুণে বড়। এই বিষয়ে সকলের চাইতে পুরাতন কাব্য-গুলি আমরা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পাইয়াছি, এবং এ পর্য্যন্ত প্রায় একশত জন মনসা-মঙ্গল লেখকের অল্প বেশী লেখা আমরা দেখিয়াছি। মনসাদেবীর ভাসান যে এক সময় দুর্গোৎসবের ন্যায়ই বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মনসাদেবীর সম্বন্ধে এই গান আমরা সংস্কৃত বইতে পাই নাই। কুন্দ ও চাঁপা ফুলের ন্যায় এই গান বাঙ্গলার খাটি নিজস্ব—এই দেশের জল, হাওয়া ও মাটিতে জন্মিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চণ্ডীমঙ্গল।

মনসা-মঙ্গলের মত চণ্ডীমঙ্গলেরও এক সময়ে খুব আদর ছিল. চণ্ডীমঙ্গলের গল্প দুইটি। তাহার একটিতে কালকেতু ও ফুল্লরার কথা আছে।

কালকেতু ব্যাধের ছেলে, পাঁচ বছর বয়সেই সে হরিণ শিকার করিতে পারিত, তখন তাহার কাণে দুইটা কুণ্ডল ছিল, সুতো দিয়া বাঁধা বাঘের নখ বুকের উপর ঝুলিত এবং দুইটি হাত লোহার শাবলের মত শক্ত ছিল। সে বাঁটুল ছুড়িয়া পাখী মারিত, এবং শিশুদের সঙ্গে যদি ঝগড়া করিত, তবে তাহাদিগের এক এক-জনকে এমনই জোরে আকড়াইয়া ধরিত, যে তার প্রাণ সংশয় ঘটিত। বাহুবলে তাহার সঙ্গে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তার শরীরটি কালো রংএ একটা জমাট মেঘের মত দেখাইত। ছোট একটা হাতীর বাচ্ছা যেমন দেখায়, সে দেখিতে তেমনই ছিল। শিশু-দের মাঝখানটায় তাকে দেখ্‌লে মনে হত যেন সে শিশুদের মোড়ল।

যখন তার উপযুক্ত বয়স হইল—তখন তার পিতা মাতা তাকে ফুল্লরার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। ফুল্লরা ব্যাধের বউ। কালকেতু শীকার করিয়া হরিণের মাংস আনিত, আর ফুল্লরা সেই মাংস মাথায় করিয়া বাজারে বেচিত। ফুল্লরা বেশ রাঁধিতে জানিত। কিন্তু তা হ'লেও তুইজনে বড় কষ্টে সংসার চালাইত। তাহারা বড় গরীব ছিল। তাদের একখানি মাত্র কুঁড়ে ঘর ছিল; তার মাঝখানে একটা ভেরাণ্ডার থাম, বৈশাখ মাসের ঝড়ে প্রায়ই সেই থাম ভাঙ্গিয়া পড়িত। বর্ষা-কালের বৃষ্টিতে কুঁড়ে ঘরের মধ্যে জল ঢুকিত, তারা কড়ির অভাবে একখানি মেটে পাথরও কিনিতে পারিত না, ঘরের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া 'আমানি' রাখিয়া দিত ও তাহাই খাইত। কোন কোন দিন মাংস বেচিতে পারিত না, এবং সেই সেই দিন বইচির ফল খাইয়া এক-রূপ উপোস করিয়া দিন কাটাইয়া দিত। কতদিন কচু পাতা দিয়া মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে মাংসের বোঝা মাথায় করিয়া ফুল্লরা বাজারের পথে চলিয়াছে, হঠাৎ চিল ছোঁ মারিয়া মাংসের অর্দ্ধেক লইয়া উড়িয়া যাইত। আষাঢ়ের নূতন জলে তুধারে কচু বন—সেই

পথ দিয়া যাইতে শত শত জোঁক আসিয়া ফুল্লরাকে ঘিরিয়া ধরিত। ফুল্লরা মনে মনে ভাবিত, এত জোঁক না আসিয়া যদি একটা সাপ আসিয়া ছোবল মারে—তবে ত তাহার জ্বালা যন্ত্রণার শেষ হইতে পারে। শীত-কালে কাপড়ের অভাবে তাহারা হরিণের ছাল পরিয়া থাকিত, একটা তালি দেওয়া বহু পুরাণা কাঁথা ছিল, কিন্তু তাহা টানিয়া গায়ে পায়ে দিতে গেলে ছিঁড়িয়া যাইত। আশ্বিন মাসে সকলে নূতন কাপড় পরিয়া আনন্দিত হইত, কিন্তু সেই উৎবের সময়ে ফুল্লরা পেট ভরিয়া ভাত পাইত না, কারণ পূজায় শত শত পাঁটা বলি হইত, ঘরে ঘরে সেই মাংস লোকে পাইত—বাজারের মাংস কে কিনিবে? বসন্তকালে মালতী ফুল ফুটিত, ভ্রমরেরা ফুলে ফুলে বেড়াইত, কোকিল ডাকিতে থাকিত—স্ত্রীলোক পুরুষেরা এই সুখের বসন্তকালে কত আমোদে দিন কাটাইত, কিন্তু ফুল্লরার দিন উপোসে কাটিয়া যাইত।

কালকেতু খুব খাইতে পারিত,—ফুল্লরা যা রাঁধিত, ক্ষুধার চোটে কালকেতু একাই তাহা সাবাড় করিয়া ফেলিত। সে তাহার মস্ত বড় দুইটা গোঁপ মোচড়াইয়া

কাণের সাথে জড়াইয়া খাওয়ার কার্য্যে লাগিয়া যাইত, এক একটা গ্রাস তুলিত যেন এক একটা "তেএঁটে" তাল। অনেক সময় সে খাইয়া চলিয়া গেলে ফুল্লরার জন্য আর কিছু থাকিত না। ফুল্লরা স্বামীকে খাওয়াইয়া খুব সন্তুষ্ট হইত—তাহার নিজের উপোসের কথা ভুলিয়া যাইত।

এত যে কষ্ট, তার মধ্যেও তাহাদের সুখ ছিল। ফুল্লরা স্বামীকে প্রাণের মত ভালবাসিত এবং কালকেতুও ফুল্লরাকে সেইরূপ ভালবাসিত। দুইজনে দুইজনের মুখ দেখিয়া আর সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইত।

মঙ্গলচণ্ডীর দয়া হইল। একদিন কালকেতু শিকার করিতে যাইয়া কোয়াশার দরুণ কোন জীব জন্তু পাইল না, কেবল একটা গোসাপ পাইল, সেইটিকে ধনুকের গুণে বাঁধিয়া লইয়া আসিল—এবং ভাবিল যে সেই গোসাপটাকে শিক-পোড়া করিয়া খাইবে। বাড়ীতে ফিরিয়া সে ফুল্লরাকে কিছু খুদ ধার করিয়া আনিতে পাঠাইল, এবং নিজে নুন কিনিতে বাজারে গেল।

কিন্তু গোসাপটি সত্য সত্য তো আর গোসাপ নয়। চণ্ডী স্বয়ং গোসাপ রূপ ধরিয়া আসিয়াছিলেন। ফুল্লরা

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা, তাঁর গায়ে ভরা গয়না, তিনি কুঁড়ে ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। ফুল্লরা তাঁহাকে অনেক ভাবে বুঝাইল যে তাঁর মত বড় লোকের মেয়ের ব্যাধের ঘরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু দেবী বলিলেন, তিনি সেইখানেই থাকিবেন। তখন ফুল্লরা তাঁহাকে একে একে তার বারমাসের কষ্ট বুঝাইতে লাগিল—এই কষ্টের মধ্যে তিনি কি করিয়া থাকিতে পারেন? দেবী বলিলেন, তিনি তাহাদের সকল দুঃখ দূর করিবেন। তখন ফুল্লরার স্বামীর উপর সন্দেহ হইল। স্বামীর ভালবাসার গর্ব্বে সে সকল দুঃখ খড় কুটার মত গণ্য করিয়াছিল, স্বামীর প্রেম হইতে পাছে বঞ্চিত হয়—সেই আশঙ্কায় তাহার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। তার পর যখন দেবী বলিলেন, "তোমার স্বামী আমাকে তাহার গুণে বাঁধিয়া আনিয়াছে" তখন সে আর সহ্য করিতে পারিল না;—দেবী গুণ অর্থ ধনু-গুণ বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু ফুল্লরা অন্যরূপ বুঝিল। সে ভাবিল এই স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর গুণে অনুরক্ত হইয়াছে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাজারে যাইয়া স্বামীর সঙ্গে দেখা করিল। কালকেতু মিথ্যা সন্দেহে রাগিয়া

গিয়া বাড়ী আসিয়া দেবীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিল। সে বলিল "চলুন, আপনাকে বাড়ী রাখিয়া আসি, ফুল্লরা সঙ্গে সঙ্গে যাইবে এবং যে পথে বহুলোকজনের বাস—সেই পথ দিয়া লইয়া যাইব।" কিন্তু বারংবার বলাতেও যখন দেবী কিছুতেই সেই স্থান ত্যাগ করিলেন না, তখন সে দেবীকে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী জ্ঞানে সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া ধনুতে তীর ছুঁড়িতে গেল—কিন্তু ছুঁড়িতে পারিল না, এবং তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

দেবী নিজরূপ ধরিয়া কালকেতু ও তাহার স্ত্রীকে দেখা দিয়া একটি অমূল্য আংটি ও সাত ঘড়া মোহর দিলেন। তাঁহার আদেশে কালকেতু গুজরাটে যাইয়া এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম ভাগে এই সকল কথা লিখিত আছে।

দ্বিতীয় ভাগে শ্রীমন্তের উপাখ্যান। ধনপতি-সদাগর উজানি-নগরের বিখ্যাত ও খুব ধনী বণিক ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল—প্রথমার নাম লহনা এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম খুল্লনা, শ্রীমন্ত এই খুল্লনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খুল্লনা লুকাইয়া মঙ্গলচণ্ডীর পূজা

করিতেন। কিন্তু ধনপতি সদাগর দেবীকে "ডাইনি দেবতা" বলিয়া গালি দিতেন এবং একদিন বাণিজ্যে যাওয়ার সময় মঙ্গলচণ্ডীর ঘট লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। বাণিজ্যে যাইয়া ধনপতি ঘোর বিপদে পতিত হন। তিনি যখন সিংহলে উপস্থিত হন, তখন চণ্ডী তাঁহাকে এক আশ্চর্য্য লীলা দেখাইলেন। সমুদ্রের মধ্যে মস্তবড় এক পদ্মবন এবং সেই পদ্মবনের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বড় যে পদ্মটি তার উপর বসিয়া এক পরমা সুন্দরী কন্যা এক হাতে একটা হাতী ধরিয়া তাহা গিলিতেছেন এবং পুনরায় তাহা মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিতেছেন। সিংহলের রাজার নিকট তিনি এই গল্প করাতে রাজা তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। তখন সর্ত্ত হইল, যদি ধনপতি রাজাকে এই ঘটনা চাক্ষুষ দেখাইতে পারেন, তবে তিনি সদাগরকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিবেন, আর যদি না দেখাইতে পারেন তবে চিরকাল তিনি কারারুদ্ধ হইয়া থাকিবেন। ধনপতি রাজাকে সেই লীলা দেখাইতে পারিলেন না। যেহেতু দেবীর ঘটে লাথি মারাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ধনপতিকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই এই মায়া-পদ্মবন

তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। ধনপতিকে জেলে যাইতে হইল এবং রাজা তাঁহার জাহাজগুলি দখল করিয়া লইলেন।

এদিকে শ্রীমন্ত বড় হইল—তাঁহার পিতাকে সে জীবনে দেখে নাই। সে যে টোলে পড়িত, সেই টোলের পণ্ডিত দানাই ওঝা তাহাকে তাহার পিতার কথা লইয়া ঠাট্টা করাতে সে স্থির করিল যেরূপে পারে সে তাহার পিতাকে খুঁজিয়া লইয়া আসিবে, না পারিলে প্রাণত্যাগ করিবে। যদিও তাহার বয়স তখন সবে বার ছিল, তথাপি সে কাহারও বাধা মান্ত না করিয়া জাহাজ লইয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিল। সিংহলদ্বীপের নিকট উপস্থিত হইয়া সেও সেইরূপ প ও হাতী-গেলা সুন্দরীকে দেখিল। এবার সিংহলরাজের সঙ্গে এই সর্ত্ত হইল যে সে যদি সেই পদ্মবন ইত্যাদি রাজাকে দেখাইতে পারে, তবে সে অর্দ্ধেক রাজ্য সমেত রাজকন্যাকে যৌতুক-স্বরূপ পাইবে, যদি না পারে তবে তাহার মাথা দক্ষিণ মশানে কাটা যাইবে।

শ্রীমন্ত নিজে যাহা দেখিয়াছিল রাজাকে তাহা

দেখাইতে পারিল না। সুতরাং দক্ষিণ মশানে তাহাকে কাটিবার জন্য জহ্লাদগণ লইয়া গেল। তখন শ্রীমন্ত 'মা' 'মা' বলিয়া চণ্ডীদেবীকে ডাকিতে লাগিল। দেবীর ভূত প্রেতেরা আসিয়া রাজার সৈন্য নষ্ট করিল এবং স্বপ্নে দেবীর আদেশ পাইয়া সিংহরাজ শালিবাহণ স্বীয় কন্যাকে শ্রীমন্তের সহিত বিয়ে দিলেন। ধনপতির বন্ধন মোচন হইল এবং পিতা পুত্র রাজ-কন্যা সুশীলাকে সঙ্গে করিয়াও অনেক অর্থসম্পদ লইয়া উজানীনগরে চলিয়া আসিলেন।

সম্ভবতঃ এই মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের প্রথমখানি ইংরেজী ১১০০-১২০০ সনে বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা যে কাব্যখানি সর্ব্বপ্রথম পাইয়াছি, তাহা মাণিক দত্তের রচিত। বোধ হয় উহা ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। মাণিক দত্তের পরে চট্টগ্রামের দেবগ্রাম-বাসী মুক্তারাম সেনের চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। এই কাব্য ইংরেজী ১৪৪৬ সনে রচিত হয়, সুতরাং ইহা ৫৭৪ বৎসর পূর্ব্বের রচনা। তাহার পর ময়মন-সিংহের কবি মাধবাচার্য্য ১৫৭৯ সনে আর একখানি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন—এখন হইতে ৩৪২ বৎসর

আগে এই পুস্তক বিরচিত হয়। আরও অনেকগুলি চণ্ডীমঙ্গল প্রায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ১৫৭৮—১৫৮৯ সনের মধ্যে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

মুকুন্দরামের বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে। ইহাঁর পিতামহের নাম ছিল জগন্নাথ, জগন্নাথের পুত্র হৃদয় মিশ্র। মুকুন্দরাম হৃদয় মিশ্রের পুত্র।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে যত কবি জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মুকুরাম একজন সর্ব্বাপেক্ষা বড় কবি। ইহার চণ্ডীকাব্যের অনেকাংশ সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল কাউএল সাহেব ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন।

কবিকঙ্কণ দরিদ্র ছিলেন, ইনি চাষ-বাস করিয়া জীবনযাত্রা চালাইতেন। দামুন্যায় মামুদ শরিফ নামক একজন ডিহিদারের কড়া শাসনে কবি পুত্র কন্যা সহ পলাইয়া মেদিনীপুর জেলায় আরড়া ব্রাহ্মণ ভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের শরণ লইলেন, এই রাজার পুত্র রঘুনাথ রায়কে তিনি পড়াইতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি

সিংহবাহিনী নামক এক দেবীমূর্ত্তির পূজা করিতেন, দামুন্যাগ্রামে এখনও সে দেবী আছেন। মুকুন্দরামের হাতের লেখা একখানি চণ্ডীকাব্য এখনও সিংহ-বাহিনীর মন্দিরে আছে। মুকুন্দরাম খুব পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার উপাধি ছিল—"কবিকঙ্কণ"। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল শিবরাম।

কবি ব্রাহ্মণ হইলেও নিজে চাষ-বাস করিয়া খাইতেন, এইজন্য দীন দুঃখীর ঘরের খবরটা তিনি ভালই রাখিতেন। তিনি তাঁহার লেখায় দরিদ্রগণের যে দুঃখ কষ্ট বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা পড়িতে পড়িতে চোখে জল আসে, আর তাঁর লেখা এমনই স্পষ্ট যে যাহাদের কথা লিখিয়াছেন, তাহারা যেন ছবির মত চোখের সাম্‌নে দাঁড়ায়। অপর অপর অনেক কবি, তাঁহাদের কাব্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সাজাইয়া ভদ্র-লোকের মত করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু কালকেতু ও ফুল্লরা মুকুন্দরামের কাব্যের দুইজন প্রধান ব্যক্তি হইলেও কবি তাহাদিগকে সাজাইতে কোনরূপ চেষ্টা পান নাই। কালকেতুর হাত দুইটা লোহার শাবলের মত, তাহার খাইবার ভঙ্গী অদ্ভুত—এই সকল কথা

এমন ভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা ব্যাধের ছেলেকে ঠিক ব্যাধের ছেলের মতই দেখিতে পাইতেছি। ব্যাধের আকৃতি প্রকৃতির অসভ্যতা সত্ত্বেও চরিত্রেও যে মহৎগুণ থাকিতে পারে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ইহা ছাড়া তাঁহার লেখায় অতি সরস ভক্তির কথা পাওয়া যায়। বইখানি পড়িলে মনে হইবে যেন সাড়ে তিনশ বছরের আগেকার ইহা একখানি নিখুঁৎ ছবি। সেই সময়ের সমস্ত খুটিনাটি কথা কাব্যের নানাদিকে ছড়াইয়া আছে। সমস্ত কাব্য জুড়িয়া দুঃখী ও অনাথের যেন একটা কান্নার সুর উঠিয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী দেবী পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত, রাগিয়া গেলে খুবই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন—খুব শিক্ষিতা মেয়েদের মত তিনি আদবেষ্ট নহেন। কিন্তু 'মা' বলিয়া ডাকিলেই তিনি সাড়া দেন। অনাথ ও দুঃখীর প্রার্থনা তাঁহার কাছে বৃথা হয় না। যে উপায়ে পারেন, দুঃখী ছেলেকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন সমস্ত কাব্যটির মধ্যে এই মাতৃভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই দুঃখ-প্রধান কাব্যে ফুল ফল ভ্রমরগুঞ্জনময় বন উপবনের কথাও আছে। খুব অন্ধকার মেঘের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ

চমকিয়া উঠে,—ঘোর বিষাদের বর্ণনার মধ্যে তেমনই সময়ে সময়ে স্বভাবের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা সেইরূপ চোখ ঝল্‌সিয়া দেয়।

মানুষের সমাজ যখন তিনি বর্ণনা করেন, তখন যাহাদের কথা বলেন তাহাদের রূপ যেন আমরা চোখের কাছে দেখিতে পাই, কথাগুলি যেন স্পষ্ট কানে শুন্‌তে পাই। কালকেতু ভগবতীর দেওয়া আংটিটি ভাঙ্গাইতে মুরারি শীল নামক এক বেনের নিকট গিয়াছে। সেই স্থানটি নীচে তুলিয়া দিলাম :—

"বেনে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল,
লেখা জোখা করে টাকা ক'ড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া,
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥

খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিক রাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ,
আমি আইলাম সেই হেতু॥

বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যানী,
আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার।
প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতক পাড়া,
কালি দিব মাংসের উধার॥

আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাষ্ঠ আন এক ভার, হাল বাকী দিব ধার,
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর।
শুনগো শুনগো খুড়ি, কিছু কার্য্য আছে দেরী,
ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।
আমার জোহার খুড়ি, কালি দিহ বাকী কড়ী,
অন্য বণিকের যাই বাড়ী॥

বাপা একদণ্ড কর বিলম্বন।
সহাস্য বদনে বাণী, বলে বেণে নিতম্বিনী,
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন।
ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ,
ধায় বেণে খিড়কির পথে।
মনে বড় কুতূহলী, কাঁধেতে কড়ির থলী,
হরপী তরাজু করি হাতে॥

করে বীর বেণেরে জোহার।
বেণে বলে ভাইপো, এবে নাহি দেখি তো,
এ তোর কেমন ব্যবহার।
খুড়া, উঠিয়া প্রভাত কালে, কাননে এড়িয়া জালে,
হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি।
ফুল্লরা পশার করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে,
এই হেতু নাহি দেখ তুমি॥

খুড়া, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।
হয়ে মোরে অনুকূল, উচিত করহ মূল,
তবে সে বিপদ আমি তরি॥
বীর দেয় অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি,
জোখে রত্ন চড়ায়ে পড়্যান।
কুঁচ দিয়া করে মান, যোল রতি হুই ধান,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

"সোনা রূপা নাই বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥
রতি প্রতি হ'ল বাপা দশ গণ্ডা দর।
হুধানের কড়ি আর পাঁচগণ্ডা ধর॥

•

অষ্টপণ পাঁচগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি॥
একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি।
কিছু চালু চালু খুদ কিছু লহ কড়ি॥
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই।
যে জন অঙ্গুরী দিল, দিব তার ঠাঁই॥
বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট।
আমা সঙ্গে সওদা করি না পাবে কপট॥
ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল নেনা দেনা।
তাহা হইতে দেখি তোমা বড়ই সেয়ানা॥
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া॥
বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি।
চালু খুদ না লইও গণি লও কড়ি॥

মুরারি নিজে বাকী কড়ি দেওয়ার ভয়ে পালাইয়া ছিল। সে টাকার লোভ পাইয়া খিড়কির দরজা দিয়া উপস্থিত হইল এবং কালকেতুকে উল্টা অনুযোগ দিয়া বলিল,—"আজকাল তুমি দেখা করতে আস না কেন?"

কালকেতু এই কপটতা বুঝিল না। সে ছিল সরল লোক। একদিকে বেণেটার ছলনা, আর একদিকে কাল-কেতুর সরলতা লেখার গুণে কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে!

কবিকঙ্কণের পরেও অনেক কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জপসা নিবাসী জয়নারায়ণ সেন যে কাব্যখানি লিখিয়াছিলেন তাহা খুব সুন্দর হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য্যের গান

সূর্য্যের গান এক সময়ে বঙ্গদেশে খুব আদর পাইয়াছিল। সূর্য্যকে এক সময়ে বাঙ্গালী কবিরা শিশুর মতন ও যুবকের মতন করিয়া কল্পনায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার বাল্য লীলা লইয়া গান বাঁধিতেন। সূর্য্যঠাকুর কাঁসারীদের ঘরের চালের কোণ দিয়া, মালীদের বাগানের লালফুলগুলিকে আরও লাল করিয়া, বামুনদের ঘরের খোলা দরজায় উঁকি মারিয়া, কলুর বাড়ীর ঘানিটার উপর চিক্‌চিকে আলোর শর ছুঁড়িয়া—পূর্ব্ব আকাশে উদয় হইতেছেন; বামুন মেয়েরা তাঁকে পৈতা উপহার দিতেছে, মালীর মেয়েরা ফুলের যোগান দিতেছে, কাঁসারীর মেয়েরা পুষ্পপাত্র দিতেছে। শিশু সূর্য্যঠাকুর হেসে হেসে সেই দান লইতেছেন। একজন জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"সূর্য্যঠাকুর উঠেছেন, বল তো ভাই ওর বর্ণটা কেমন ?"

সে বলিল, —"আগুন বর্ণ।"

আর একজন বলিল,—"রক্তবর্ণ।"

তাহাও হইল না, আর একজন বলিল,—"পান খেয়ে যে ঠোঁট লাল হয়, এ সেই বর্ণ।"

সকলের কথাই ঠিক। যখন সূর্য্যদেব প্রথম উঠেন, তখন চোখ দুটি যেন জবা ফুলের মত রাঙ্গাইয়া চাহিতে থাকেন। যাঁহারা পানের লাল, রক্তের লাল, আর জবার লাল দিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিলেন, তাঁহারা সবটুকু বুঝাইতে পারিলেন না। কারণ তাঁর রঙ্গের মধ্যে একটু তাপ আছে, এইজন্য "আগুন বর্ণ" বলিয়া একজন সেই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

তারপরে সূর্য্যের অভিষেক,—চন্দনের বাটী লইয়া মা আসিয়াছেন, কাঁসর, করতাল ও শাঁখ বাজাইয়া পাড়াপড়সীরা সূর্য্যের ঘুম ভাঙ্গাইতেছেন। এ সকল কবিতায়, যে ঠাকুর শত শত যোজন দূরে, তাঁকে যেন ভক্ত কবি একেবারে ঘরের আঙ্গিনার কোণে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। এইজন্য কবিতা-গুলি ভারি মিষ্ট।

তারপর সূর্য্যঠাকুর যুবক হইয়া দাঁড়াইলেন। বামুনের মেয়েরা তাঁদের সাড়ী শুকাইতে দিতেন, কোন

মেয়ে তাঁহার লম্বা কালো চুলগুলি সূর্য্যের সাম্‌নে রাখিয়া বসিয়া যাইতেন, কোন মেয়ে পায়ের মল বাজাইয়া রাস্তায় যাইতেন, এ সকল দেখিয়া সূর্য্যঠাকুরের বিয়ে করিবার ভারি সাধ হইল।

ছোট্ট ক'নে-বউ গৌরীকে বিয়ে করিয়া সূর্য্যঠাকুর নৌকা-যোগে বাড়ী চলিলেন। মেয়ে কাঁদিয়া বাপ-মায়ের কাছে আবদার করিতে লাগিল,—"আমায় পরের বাড়ীতে যেতে দিও না।"

মা কাঁদিতে লাগিলেন। বাবা গামছা দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—"আমি সভার মধ্যে টাকা লইয়া পরকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি, এখন কি করিয়া তোমায় রাখিব?"

গৌরীকে হারাইয়া ভাইটি খাটের খুরা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল,—এই না দুইদিন আগেও সেই ভাই কত ঝগড়া করিয়া গৌরীকে গাল মন্দ দিয়াছে। ছোট বোনটি খেলার পুতুল ফেলিয়া দিদির জন্য কাঁদিতে লাগিল—এই না সেদিন পুতুল লইয়া দিদির সঙ্গে তার আড়ি হইয়াছিল।

গৌরী "নাইওরের ভাত" খাইতে বসিয়া কাঁদিতেছে

—তার পর যখন সূর্য্যঠাকুর তাহাকে লইয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন গৌরী বিনয় করিয়া মাঝিকে বলিতেছে,—"মাঝি ভাই, অত তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিও না,—মা কাঁদিতেছেন তুমি ধীরে নৌকা চালাও, ঐ কান্না যেন আর একটু শুনিতে পাই।"

তার পর একা কন্যা স্বামীকে বলিতেছেন,—"আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি, আমার ক্ষুধা হইলে কোথায় ভাত পাইব ?"

উত্তরে সূর্য্যঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন,—"আমি শত শত চাষী নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছি। তাহারা তোমার জন্য সরু চালের ধান তৈরী করিতেছে।"

"আমি তোমার সঙ্গে যাইব,—আমার পরিবার কাপড় কোথায় পাইবে।"

"শত শত তাঁতি তোমার শাড়ী তৈরী করিতে নিযুক্ত করিয়াছি।"

"আমি তোমার সঙ্গে যাইব,—কে আমায় শাঁখা পরাইবে ?"

"আমি আমার রাজ্যময় শাঁখারীদের নিযুক্ত করিয়াছি, তারা তোমার জন্য শাঁখা গড়াইতেছে।"

কিন্তু এ সকল কথা ত কথা নয়—তার যে কথা বলিতে বুক ফাটিয়া যাইতেছে, অবশেষে স্বামীর কোঁচায় মুখ লুকাইয়া চক্ষের জল সংবরণ করিয়া গৌরী সে কথাটি বলিয়া ফেলিল। তখন তাঁর কোমল ঠোঁট দুখানি কাঁপিতেছিল ও চোখের জল স্বামীর কোঁচায় মিশিয়া ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। গৌরী বলিল—

"তোমার দেশে যাইমু সূর্য্য
আমি 'মা' বলিমু কারে ?"

তখন উভয়ে ডাঙ্গায় উঠিয়াছেন। অতি স্নেহে অতি আদরে গৌরীর মুখখানি বুকে ঢাকিয়া সূর্য্যঠাকুর বলিতেছেন,—

"আমার যে মা আছে 'মা' বলিবে তারে।"

এই সূর্য্যের গানে দেবতারা মানুষের ঘরে আসিয়া লীলা খেলা করিতেছেন, তাঁহাদের আমরা আপনার জনের মতন পাইতেছি। বৈষ্ণব-কবিতা এই ভাবের সৌন্দর্য্য আরো শতগুণে বাড়াইয়াছিল, তাহা পরে লিখিব।

আমার যে মা আছে, 'মা' বলিবে তারে—৪০ পৃষ্ঠা।

শীতলা-মঙ্গল

মনসাদেবীর পূজার শত্রু ছিলেন চাঁদসদাগর। মঙ্গলচণ্ডীকে ধনপতি সদাগর কিছুতেই দেবী বলিয়া স্বীকার করেন নাই; শেষে কিন্তু চাঁদসদাগর মনসা দেবীকে পূজা করিয়াছিলেন এবং ধনপতি মঙ্গলচণ্ডীর ভক্ত হইয়াছিলেন। সেইভাবে চন্দ্রকেতু ছিলেন শীতলা-দেবীর পূজার বিরোধী; কিন্তু শেষে চন্দ্রকেতুকে শীতলাদেবীর পূজা করিতে হইয়াছিল। আমরা অনেক-গুলি পুরাতন শীতলামঙ্গল পাইয়াছি।

এগুলি ছাড়া আরও অনেক রকমের জিনিষ পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে পাইয়াছি, তাহার কতকগুলির কথা সংক্ষেপে বলিয়া যাইব।

শিবঠাকুরের গান

প্রায় দুইশত বছর পূর্ব্বে রামেশ্বর নামক কবির 'শিবায়ন' লেখা হইয়াছিল। শিবায়ন শব্দটি 'রামায়ণ' শব্দের মত। এই শিবায়ণে শিবঠাকুরের অনেক কীর্ত্তির কথা উল্লেখ আছে।

যদিও রামেশ্বর খুব বেশী পুরাণা কবি নহেন, তবুও তিনি যে অনেকদিনের পুরাণা একটা ছড়াকে নূতন করিয়া সাজাইয়া বই লিখিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। এক এক জায়গায় ভাষা যে খুব বহুদিনের, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই কাব্যের ভাবগুলি সেই সময়ের, যখন চাষারাই বাঙ্গালা গান বাঁধিত ও গাহিত। শিবঠাকুর একবারেই ভদ্রঘরের লোকের মতন নহেন; তিনি দস্তুর মত চাষা। ইন্দ্রের কাছে বাঘের ছাল ও শূল বাঁধা দিয়া এক জোড়া বলদ, কয়েক কানি জমি ও হাল প্রভৃতি লইয়া চাষের কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। তাঁহার চাকরের নাম ছিল ভীম। কাস্তে হাতে আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া,জমিটা নিংড়াইয়া শিবঠাকুর চৌকোণা ক্ষেত তৈরী করিয়া—আইল বাঁধিয়া ফেলিলেন। দলদূর্ব্বা, শ্যামা, ত্রিশিরা এবং কেশর প্রভৃতি কতরকম আগাছা সেই ক্ষেত হইতে উঠাইয়া ফেলিলেন।—সেই সকল বুনো লতা ও ঘাসের অনেকগুলির নাম চাষারা ছাড়া আর কেহ জানে না। ভূমি ভাল করিয়া চষিয়া ফেলিয়া তাহাতে 'মহীপাল' 'গোপাল-ভোগ','সোণার ছড়া'প্রভৃতি নানারকমের ধান

বুনিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা দেশে যে কত রকমের সরু, মোটা, সুগন্ধ, সুন্দর চাল জন্মাইত, তাহাদের কত রকমের নাম ছিল—তাহা এই সকল বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়।

শিবঠাকুর নিজে বুড়, ভীমকে দিয়া চাষ করাইতেন এবং রাত দিন ক্ষেতের পাহারা দিয়া বসিয়া থাকিতেন, "দাদ নাই বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া।" ঠিক বাঘের মত খেতের ধারে তিনি দুইটা জ্বল্ জ্বল্ চোখে চাহিয়া পশু পাখীর উৎপাত হইতে ধান রক্ষা করিতেন।

এদিকে বয়সে বুড় হইলেও তিনি লোকটি বড় সহজ ছিলেন না। ডোমের পাড়া, কুচনি পাড়া এই সকল ছোট লোকের পাড়ায় যাইয়া মেয়েদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস ইত্যাদি চালাইতেন।

এদিকে তাঁহার স্ত্রী দুর্গার বড়ই অশান্তি হইত। ক্ষেতের অছিলা করিয়া শিবঠাকুর কোথায় যান, কোথায় থাকেন, তার ঠিকানা নাই,—হয়তো রাতেও ফিরিতেছেন না। রাগিয়া দুর্গা ঠাকরুণ জোঁক ও মশা পাঠাইয়া দিলেন, তাহারা শিবঠাকুরের ক্ষেত ঘিরিয়া ধরিল। বুড় শিব, ভীম চাকরকে চুণের জল দিয়া

জোঁক মারিতে শিখাইতে লাগিলেন এবং ক্ষেতে ঘুঁটে, পোড়াইয়া এমনই একটা কাণ্ড করিতে লাগিলেন—যে মশাগুলি আর তিষ্ঠিতে পারিল না। এদিকে দুর্গা একদিন ডুম্নী সাজিয়া খেয়া নৌকায় যাইয়া চড়িয়া বসিলেন,—দুর্গার মূর্ত্তিটি ছিল ভারি সুন্দর, ডুম্নীদের মত শাড়ী ও গলায় ফুলের মালা পরাতে শিবঠাকুর তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। বুড় লোকটি সহজ ছিলেন না, আগেই বলিয়াছি। তিনি দুর্গাকে ডুম্নী ভাবিয়া তার সঙ্গে রসিকতা করিতে গেলেন। তখন দুর্গা ক্ষেপিয়া গিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, লজ্জা ও ভয়ে শিবঠাকুরের মুখ শুকাইয়া গেল। এই ভাবে রোজই 'শিব-দুর্গার কোন্দল' চলিতে লাগিল। এক দিন দুর্গা শিবের নিকট একজোড়া শাঁখা চাহিয়াছিলেন, শিব বলিলেন, "আমি কোথা পাব ?

"বাপ বটে বড় লোক, বল গিয়া তায় ;"

এই কথা শুনিয়া এক হাতে কার্ত্তিককে ধরিয়া গণেশকে কোলে লইয়া রাগিয়া দুর্গা বাপের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। তখন নারদ আসিয়া উপস্থিত। শিব ঠাকুর দুর্গা-ছাড়া হইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিলেন।

নারদ বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন—আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে তাহা শোন নাই ?

"পাথারে ফেলিয়া গেল, পর্ব্বতের ঝি।"

ইহার পরে নিজে শাঁখারী সাজিয়া হিমালয় পুরীতে গিয়া দুর্গাকে নিজ হাতে শাঁখা পরাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন শিব দুর্গার ভাব হইল।

এই গান মস্ত বড়, কিন্তু ইহা খাঁটি-চাষার গান। ক্ষেতের কথা, চাষ-আবাদের কথা, ধান চাউলের কথা, —গ্রাম্য রসিকতা, দরিদ্র ঘরের অভাব-অভিযোগ, গ্রাম্য-কলহ, অশিক্ষিত লোকের ঠাট্টা-তামাসা—প্রভৃতি পড়িলে মনে হয়, ছোট লোকের পাড়ায় আসিয়া ঢুকিয়াছি। এই চাষাদের হাতের আঁকা শিব—গ্রাম্য-মোড়লের মত ; বেশ কয়েকটা হৃষ্টপুষ্ট বলদ, ধানভরা ক্ষেত,—দুর্গাও হাঁস্‌লী পরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত ; চাষারা তাদের ঠাকুর ঠাকুরাণীর কথা তাদের মনের মতন করিয়া লিখিয়াছে। ইহার মাঝে মাঝে বেশ সুন্দর ছবির মত কতকগুলি বর্ণনা আছে। যে জায়গায় শিব খাইতে বসিয়াছেন, কার্ত্তিক—গণেশ খাইতে বসিয়া-

ছেন,নন্দীভৃঙ্গীও প্রসাদের জন্য হাত পাতিয়াছে—এলো চুলে দুর্গা পরিবেশন করিতেছেন। একা নানারূপ খাদ্য দিয়া সারিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কেউ বলিতেছে, ভাত দেও, কেউ বলিতেছে, আর একখানি ভাজা, কেউ ব্যান্নুনের জন্য হাঁকিতেছে। দুর্গা বলিতেছেন—"একটু ধীরে ধীরে খাও; সব দিতেছি।" এদিকে শিব ঠাকুর একটা পাড়াগেঁয়ে রসিকতা শিখাইয়া দিতেছেন, গণেশ বলিতেছে—"আমরা ধীরে খাইতে জানি না, রাক্ষসীর পেটে হয়েছি—রাক্ষসের মত খাব।" শিব ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, এদিকে সব দিতে যাইয়া দুর্গা অবসর পাইতেছেন না, তাহার সুন্দর মুখে মুক্তার ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে, তাড়াতাড়ি যাতায়াতে আঁচল বায়ুতে উড়িয়া যাইতেছে, এলো চুল পিঠ ছুঁইয়া দুলিতেছে—তখন কি শোভাই না হইয়াছে! বাঙ্গালার কুঁড়ে ঘরেও যে অন্নপূর্ণা দেবী বিরাজ করিতেছেন, এই ছবি দেখিলে তার সম্বন্ধে আর ভুল হয় না।

রামেশ্বরের শিবায়ণের একটা দোষ চোখে বাজে। যেখানে কবি পুরাণা ভাষা ও ভাব বজায় রাখিয়াছেন, সে স্থানগুলি বেশ লাগে, কিন্তু যেখানে এই পুরাণা

মাল-মসলা নূতন সাজে আনিয়াছেন, সেইখানেই ঠকিয়াছেন। ভাষায় সংস্কৃত শব্দ আনিয়া এই পাড়া-গাঁয়ের ছড়াটিকে মাঝে মাঝে বড়ই খাপ্‌ছাড়া করিয়া ফেলিয়াছেন। চাষাদের কথা চাষাদের ভাষাতেই মানায়, সেই কথার মধ্যে পণ্ডিতী চাল দিলে তাহা মাটী হইয়া যায়। রামেশ্বরী শিবায়ণে স্থানে স্থানে এই গুরুচণ্ডালী দোষ হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য।

বৌদ্ধধর্ম্মটা এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার কিছু পূর্ব্বে ইহার আকারটা বড়ই অদ্ভুত রকমের হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেব ধর্ম্মঠাকুর নামে ছোটলোকের মধ্যে পূজা পাইতেছিলেন। এই ধর্ম্মঠাকুরের পূজার গানও একসময়ে বাঙ্গালা দেশে খুব আদর পাইয়াছিল। "ধর্ম্ম-মঙ্গল" কাব্যের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, লাউসেন। ইনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনের পুত্র ছিলেন। লাউসেনের মায়ের নাম ছিল রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতী, গৌড়ের রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের শ্যালিকা ছিলেন।

ধর্ম্মপালের শ্যালক ছিলেন মহামদ—লোকে ইঁহাকে 'মাহুত্তা' বলিয়া ডাকিত। মহামদ গৌড়ের রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

ধর্ম্মপালের গোয়ালা জাতীয় এক প্রজা ইছাই ঘোষ খুব প্রবল হইয়া বিদ্রোহী হয়; ইছাই ঘোষ

ঢেকুর নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করে। ধর্ম্মপাল অনেকবার তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়া দেন, কিন্তু ইছাই ঘোষ তাঁহাদিগকে বারংবার যুদ্ধে হঠাইয়া দেয়। ইছাই ঘোষ "শ্যামরূপা" নামক এক কালীমূর্ত্তির পূজা করিত। এই দেবীর বরে কেহ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিত না। তাহার রাজধানী "ঢেকুরের" নাম হইয়াছিল "অজয় ঢেকুর" অর্থাৎ কোন শত্রুই ঢেকুরকে জয় করিতে পারিত না।

ইছাই ঘোষের বাপ সোমাই ঘোষ গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপালের সাধারণ একজন চাকর ছিল, সুতরাং তাহার এই ব্যবহারে রাজা ভারি চটিয়া যান। ধর্ম্মপাল ছিলেন "রাজচক্রবর্ত্তী" অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশের অপরাপর রাজারা ছিলেন তাঁর অধীনস্থ রাজা। মেদিনীপুরের ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনও সেইরূপ তাঁহার একজন অধীন রাজা ছিলেন। এইরূপ অধীন রাজাদিগকে "সামন্ত রাজা" বলা হইত।

ধর্ম্মপালের আদেশে বৃদ্ধ কর্ণসেন তাঁহার সাত পুত্র লইয়া ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে সাত পুত্র মরিয়া যায় এবং কর্ণসেন যুদ্ধে হারিয়া

আইসেন। কর্ণসেনের রাণী পুত্রগণের মৃত্যুতে শোকে প্রাণ ত্যাগ করেন। কর্ণসেনের বয়স তখন প্রায় ৮০ বৎসর। এই বয়সে এইরূপ শোক পাইয়া কর্ণসেন সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সন্ন্যাস লইয়া বনে যাইবার পূর্ব্বে রাজা ধর্ম্মপালের নিকট বিদায় লওয়ার ইচ্ছায় একবার গৌড়ে যান। ধর্ম্মপাল দেখিলেন, তাঁহারই জন্য এই সামন্ত রাজা সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফকিরী লইতেছেন, তাঁহার চিত্ত কর্ণসেনের দুঃখে গলিয়া গেল। তিনি তাঁহার শ্যালিকা পরমা সুন্দরী ষোলবর্ষ-বয়স্কা রঞ্জাবতীকে কর্ণসেনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া বৃদ্ধ রাজাকে আবার সংসার ধর্ম্মে মতি লওয়াইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি. প্রধান মন্ত্রী মহামাদ রঞ্জাবতী ও গৌড়ের রাণীর সহোদর ভাই ছিলেন। ছোট বোন-টিকে যখন রাজা, ৮০ বৎসরের বরের হাতে দিলেন, তখন মন্ত্রী গৌড়ে ছিলেন না। তিনি বাড়ী আসিয়া এই কাণ্ডটা দেখিয়া অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং রঞ্জাবতীকে এই বুড় স্বামীর ঘর করিতে নিষেধ করি-লেন। কিন্তু রঞ্জাবতী বড় ভাইএর কথা তুচ্ছ করিয়া স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেলেন। মহামাদ এই ব্যবহারে

রঞ্জাবতীর উপরও অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ময়নাগড়ে আসিয়া রঞ্জাবতী বহু তপস্যা করিয়া ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিতে লাগিলেন, এমন কি তিনি শালে চড়িয়া নিজকে ধর্ম্মঠাকুরের নিকট বলি দিয়া শেষে তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

এই সকল তপস্যার ফলে তিনি এক পুত্র লাভ করিলেন, পুত্রের নাম হইল লাউসেন।

ধর্ম্মপাল রাজার প্রধান মন্ত্রী মহামাদ লাউসেনের মামা ছিলেন, এবং তিনি লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতীর উপর চটিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাহুদ্যা মন্ত্রী গৌড়ের রাজাকে দুষ্ট বুদ্ধি দিয়া লাউ-সেনকে খুব বিপদপূর্ণ যুদ্ধ-বিগ্রহে পাঠাইয়া দিতেন। মামার ইচ্ছা ছিল যাহাতে ভাগিনেয় লড়াই করিতে যাইয়া মারা যায়, যেহেতু তাহা হইলে রঞ্জাবতী খুব জব্দ হইবেন। লাউসেন ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা করিয়া সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। তাঁহার মেসো মহাশয় ছিলেন গৌড়ের রাজা, এদিকে তিনি ছিলেন মেসোর অধীনে সামন্ত রাজা; সুতরাং যেখানে তিনি লাউসেনকে যাইতে বলিতেন, তাঁহাকে সেইখানেই

যাইতে হইত। রাজা ইছাই ঘোষকে দমন করিতে লাউসেনকে ঢেকুরে যাইতে হুকুম দিলেন। লাউসেনের সেনাপতি ছিল কালুডোম, কালুডোম একটি মহাবীর ছিলেন। ইছাই কালুডোমের মাথা কাটিয়া ফেলিল। ধর্ম্ম ঠাকুরের বরে লাউসেন তার কাটামুণ্ড জোড়া দিয়া বাঁচাইয়া দিলেন এবং শেষে ইছাই ঘোষকে বধ করিলেন। মাহুদ্যা মন্ত্রী আরও অনেক যুদ্ধে লাউসেনকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম ঠাকুরের বরে সর্ব্বত্র লাউসেন জয়লাভ করিলেন। অবশেষে মাহুদ্যা রাজাকে একদিন বলিলেন, লাউসেন এত বড় বীর যে সে ইচ্ছা করিলে সূর্য্যকে পশ্চিমে উদয় করাইতে পারে। গৌড়ের রাজা লাউসেনকে পশ্চিম হইতে সূর্য্যোদয় দেখাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। একদিকে দুরন্ত মামা, অপরদিকে বুদ্ধিহীন মেসো, ইহাদের চক্রান্তে পড়িয়া লাউসেন কত না বিপদে পড়িয়াছেন! ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিয়া লাউসেন সূর্য্যকে পশ্চিম হইতে উদয় করাইলেন। এই সকল বিষয় ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লিখিত আছে। এই কাব্যের আদি লেখক ময়ূর ভট্ট ইং ১২০০ সনের কাছাকাছি কোন সময়ে একখানি ধর্ম্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন, তার

পর রূপরাম, মাণিক গাঙ্গুলী, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। ১৭১৩ ইং সনে বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের সময় তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল পালা রচনা করেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল ও বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ঘনরামের ধর্ম্ম-মঙ্গল ছাপা হইয়াছে, আরগুলি এখনও ছাপা হয় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নাথ-গীতিকা।

গোরক্ষ-বিজয়।

নাথ-সম্প্রদায় নামক এক শ্রেণীর লোক ইং ১১০০—১২০০ সনে বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে প্রবল হইয়া উঠেন। ইহাঁরা বৌদ্ধধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্ম এই দুই ধর্ম্ম হইতে মত সংগ্রহ করিয়া একটা মাঝামাঝি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এই ধর্ম্মের নাম নাথধর্ম্ম।

এই ধর্ম্মের গুরু ছিলেন মীননাথ। মীননাথের প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ সম্ভবতঃ পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথ বাঙ্গালা দেশেই অনেক কাল কাটাইয়াছিলেন, এদেশে তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। 'গোরক্ষ বিজয়' নামক একখানি পুরাণা কাব্য পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকের খসড়া তৈরী হইয়াছিল ১১০০।১২০০ সনে, তার পরে অনেক

কবি সেই খসড়ার উপর হাত বুলাইয়া ভাষাটা শেষে কতকটা সহজ করিয়া ফেলিয়াছেন,—এই কবিদিগের মধ্যে ভবানী দাস, ফয়জুল্লা, ও ভীমদাস সেন প্রধান।

গোরক্ষনাথের জীবনের অনেক কথা এই বই-গুলিতে পাওয়া যায়। ইহার লেখা কতকটা পুরাণে লিখিত গল্পের ন্যায়—তথাপি ইহাতে খুব উচ্চাঙ্গের নীতি ও ধর্ম্মের কথা আছে।

একদিন শিবঠাকুর খুব নিরালায় সমুদ্রের উপর একটা "টঙ্গী"তে বসিয়া দুর্গাকে জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেছিলেন। এই উপদেশের নাম "মহাজ্ঞান"। ইহা যে শোনে সে মড়াকে বাঁচাইতে পারে ও সকল দেবতারা তার বশীভূত হন। যেখানে শিব-দুর্গা কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, সেই স্থান হইতে খুব নীচে সমুদ্রের জলের তলায় বসিয়া সেই সময় মীন-নাথ তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি দৈবাৎ শিবের মহাজ্ঞানের তত্ত্ব শুনিতে পান। শিব বুঝিতে পারি-লেন, মীননাথ চুরি করিয়া তাঁর সব জ্ঞান শিখিয়া লইয়াছেন। তখন তাঁহাকে অভিশাপ দেন—"আমি স্ত্রীর সঙ্গে নিরালায় যাহা বলিতেছিলাম, তাহা তুমি

যেরূপ চোরের মত শুনিয়া লইয়াছ, তাহার দণ্ড এই হইবে যে তুমি স্ত্রীলোকের মায়ায় বদ্ধ হইয়া সেই জ্ঞান হারাইবে।"

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে মীননাথ তাঁহার জ্ঞান হাড়িপা, কালুপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি শিষ্যদিগকে শিখাইয়া ফেলিলেন।

একদিন দুর্গা শিবকে বলিলেন, "তুমি তোমার সাধুদের বৃথা বড়াই করিয়া থাক, স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে চোখের চাউনি দিয়া তাঁহাদিগকে পাগল করিতে পারে। স্ত্রীলোকের মায়ায় বশীভূত না হয়, এরূপ সাধু জগতে নাই।"

শিব-ঠাকুর বলিলেন—"আচ্ছা তুমি আমার সাধু-দিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহাদের মন টলাইতে পার কিনা।"

তখন দুর্গা পরমাসুন্দরী রূপসী সাজিয়া সাধুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথম ভুলিলেন, গুরু মীননাথ। তিনি বলিলেন, "যদি এমন সুন্দরী স্ত্রী পাই, তবে আমি "মহাজ্ঞান" পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে পারি।" দেবী বলিলেন "তাহাই হউক, তুমি

কদলী-পত্তন নামক দেশে যাও, সেখানে আমার মত ষোলশ' সুন্দরী আছে, তাহাদিগকে পাইবে, কিন্তু মহা-জ্ঞান হারাইবে।" মীননাথ কদলী পত্তনের দিকে চলিয়া গেলেন। তার পর ভুলিলেন, হাড়িপা। তিনি বলিলেন, "যদি এইরূপ সুন্দরী পাই, তবে আমি অতি হেয় ও নীচ হাঁড়ির কাজ করিতেও রাজী আছি।"

দেবী বলিলেন "তাহাই হউক তুমি ঝাঁটা ও হাঁড়ি হাতে লইয়া মেহেরকুলে যাও, সেখানে রাণী ময়নামতী আমার মতই সুন্দরী, তাঁহাকে পাইবে, কিন্তু তোমায় হাঁড়ি হইয়া রাস্তা ঘাট ঝাঁট দিতে হইবে।"

হাড়িপা মেহেরকুলের দিকে চলিয়া গেলেন। তার পর ভুলিলেন কালুপা—তিনি বলিলেন "যদি এমন সুন্দরী পাই, তবে আমার ডান হাতখানি যদি কেউ কাটিয়া ফেলে, তাও সহিতে পারিব।"

দেবী তাঁহাকে সেই বর দিলেন, কালুপা অপর এক দেশে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু গোরক্ষনাথ অচল, অটল—দেবী কত হাব ভাব দেখাইলেন,—কত মনভুলানো চাউনি চাহিলেন।

গোরক্ষ যোগী বলিলেন "ছিঃ ছেলের কাছে কি মায়ের এই সকল ভাব সাজে ?"

পুনঃ পুনঃ দেবী গোরক্ষকে ভুলাইবার নানা ফন্দী করিলেন,—গোরক্ষ যদিও পরম সুন্দর নব যুবক,—তথাপি তিনি খাঁটি সাধু,তাহাকে দেবী এক তিলও নড়াইতে পারিলেন না,--মহাদেবের কাছে দেবীর মুখ এতটুকু হইয়া গেল , তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, জগতে অন্ততঃ একজন লোকও এমন আছে, যাহাকে স্ত্রীলোক রূপের মায়াজাল বিস্তার করিয়াও টলাইতে পারে না।

গোরক্ষ যোগী একদিন এক নবীন যোগীর ব্যবহারের দোষ ধরিয়াছিলেন, তাহাতে সে রাগিয়া তাঁহাকে বলিল—"আপনি কি যোগবলের বড়াই করিতেছেন ? আপনার গুরুভক্তি নাই, আপনি আবার অপরকে নীতি শিখাইতে আইসেন ? আপনার গুরু মীননাথ কদলীপত্তন নগরে যাইয়া যোলশ' রূপবতী স্ত্রীলোকের মায়ায় পড়িয়া "মহাজ্ঞান" হারাইয়াছেন,—তিনি আর তিনদিন পরে মারা পড়িবেন, আর আপনি তাঁহার উদ্ধারের কোন উপায় না করিয়া এইখানে যোগ বলের বড়াই করিতেছেন। আপনার গুরুর দাঁতগুলি

পড়িয়া গিয়াছে, চোখের জ্যোতি কমিয়াছে, গাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, শরীর মুইয়া গিয়াছে—আর আপনি অপর যোগীর শিষ্যকে গুরুভক্তি শিখাইতেছেন—আপনাকে ধিক্ !"

গোরক্ষনাথ তখনই কদলী-পত্তনের দিকে যাত্রা করিলেন। কদলীপত্তনে এখন মীননাথ রাজা—সে রাজ্যে একটি পুরুষ মানুষ নাই,—সকলেই স্ত্রীলোক, সকলেই সুন্দরী, তাহাদের এক একজন শত শত সাধুর মন টলাইতে পারে, এমনই তাহাদের রূপ ও মায়া। মীননাথ সে রাজ্যের রাজা হইয়া আশঙ্কা করিলেন, যদি আর কোন যোগী আসিয়া যোগবলে তাঁহার এই সুখের রাজ্য কাড়িয়া লয়, এইজন্য আদেশ করিলেন, তাঁহার সেই রাজ্যে কোন যোগী ঢুকিতে পারিবে না,

"বুড়ো যোগী পাইলে চোপাড়ে (১) ভাঙ্গে গাল।
গাভুর (২) যোগী পাইলে তুলিয়া দেন শাল (৩)॥
অধ বসী (৩) যোগী পাইলে বৈধ্য দেশ কাটে।
পোলা যোগী পাইলে পাটাত তুলি বাটে॥" (৪)

---

(১) থাপড় দিয়া। (২) গাভুর—যুবক। (৩) শালে দিয়া হত্যা করে। (৩) অর্দ্ধবয়সী—অধবসী। (৪) শিশু যোগী পাইলে শিলায় বাটিয়া ফেলে।

গোরক্ষ যখন সেই নগরে ঢুকিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া একটি বারুই জাতীয় রূপসী স্ত্রীলোক ভুলিয়া গেল এবং সাধুর বেশে গেলে যে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে এই কথা বলিয়া দিল। গোরক্ষনাথ কোন-রূপে তাহার হাত এড়াইয়া রাজপুরীর নিকটে যাইয়া নিজে পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক সাজিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন, তাঁহার হাতে মৃদঙ্গের বোলে যেন রাজপুরী কাঁপিয়া উঠিল। সেই আওয়াজ মীননাথের কাণে প্রবেশ করা মাত্র, তিনি কি যেন কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা একটু একটু মনে হইতে লাগিল; মৃদঙ্গের বোল কর্ণে যেন মধু ঢালিয়া দিল কিন্তু তাঁহার চারিদিকে যে স্ত্রীলোকেরা ছিল, তাহারা চেষ্টা করিতে লাগিল যেন মীননাথ সেই মৃদঙ্গবাদিকাকে ডাকিয়া কাছে না আনেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া মীননাথ রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাচ দেখিয়া ও খোলের বাদ্য শুনিয়া মীননাথের মনে এক দিকে আনন্দ, অপর দিকে ভয় হইল। কে যেন তাঁহাকে তাঁহার সুখের রাজ্য-পাট ছাড়াইয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের হাট ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইতে
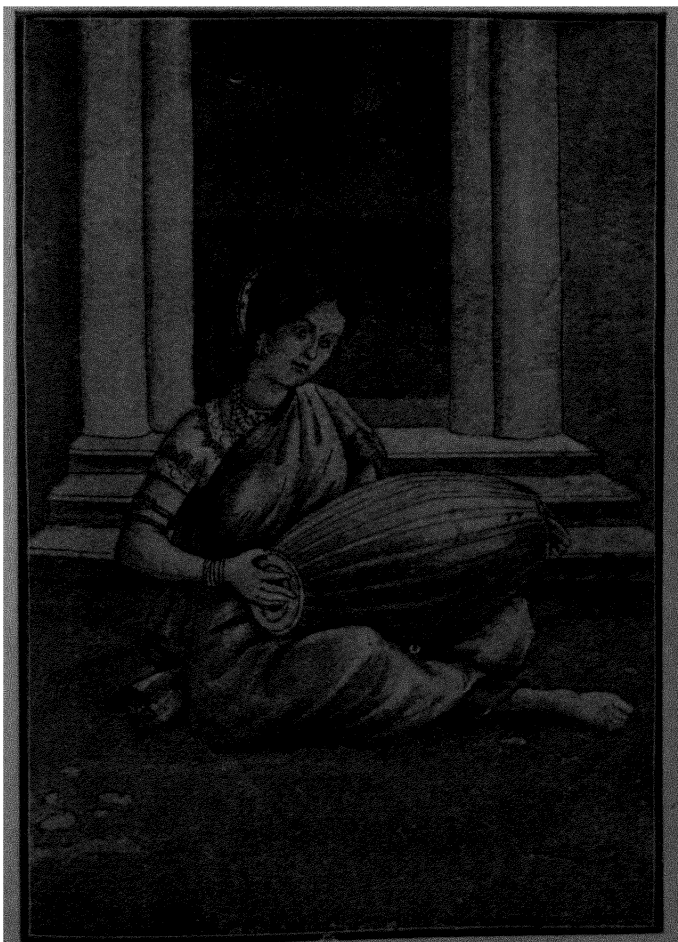
সুন্দরী স্ত্রী সাজিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন—৬০ পৃষ্ঠা।

আসিয়াছে—তাহার ডাক এত মধুর যে তাহা তিনি এড়াইতে পারিতেছেন না, অথচ তাহা তাঁহার সুখের সংসারের উপর বজ্রাঘাতের স্থায়। তিনি খোলের একটা শব্দ বুঝিলেন—উহা যেন তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া ডাকিয়া, পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া কি বলিতেছে, আর একটি কথা বুঝিলেন, তাহা "কায়া-সাধ"।

"নাচন্ত (১) যে গোর্খনাথ তালে করি ভর। (২)
মাটীতে না লাগে পদ আলগ (৩) উপর॥
নাচন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরের (৪) রোলে।
নবীন কোকিল (৫) যেন আধ আধ বোলে॥
হাতের ঠমকে নাচে পদ নাহি নড়ে।
'কায়া সাধ' 'কায়া সাধ' মন্দিরায় বোলে॥
হাতের ঠমকে নাচে গাআ (৬) নাহি নড়ে।
গগন মণ্ডলে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চরে॥"

'কায়া-সাধ' অর্থ এই, দেহ দিয়া সাধনা করিতে হইবে। ঐহিক সুখ ছাড়িয়া দিয়া 'মহাজ্ঞান' লাভ করিবার পথে দেহের সাধনাই বড় সাধনা।

---

(১) নাচন্ত—নাচিতে লাগিল। (২) তালের সঙ্গে মিল রাখিয়া। (৩) আলগ—শূন্যের। (৪) একরূপ বাজনা, ঘুঙ্গুর। (৫) কোকিল। (৬) গাআ নাহি নড়ে—শরীর নড়ে না।

অবশেষে মীননাথ গোরক্ষকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু কাতরভাবে বলিলেন,—"গোরক্ষ আমার প্রাণ-প্রিয় শিষ্য, তুমি আসিয়াছ সুখী হইলাম, কিন্তু সেও কি সম্ভব? একশত সুন্দরী আমায় চামর ব্যজন করে,—দুধের বর্ণ বিছানায় শুইয়া ঘুমাই, আমার দরজায় শত শত অস্ত্রধারী পাহারা—আমি কি আর বনে জঙ্গলে ঘুরিতে পারিব?"

চারিদিক হইতে সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা বলিয়া উঠিল, —"আপনি কি আর ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া জঙ্গলে ঘুরিতে পারিবেন? সোনার থালায় নানাবিধ মিষ্ট খাদ্য খাওয়ার পর বনের তেতো ফল কি আর গলায় ঢুকিবে? রাত্রে গাছের তলায় শুইয়া থাকিবেন, আপনার পাহারা হইবে, শেয়াল—তারা রাত্রে প্রহরে প্রহরে চীৎকার করিয়া আপনার ঘুম ভাঙ্গাইবে। আপনার সোনার ঝালরযুক্ত রাজছত্র, এই হীরামতি ঝুলানো চাঁদোয়া, এই সোনার খাট ইহার পরিবর্ত্তে আপনাকে শুক্‌নো পাতার উপর শুইয়া থাপড় দিয়া মশা মাছি মারিতে হইবে। আপনার কখন ক্ষুধা হয়—এই চিন্তা করিয়া শত শত রাণী আপনার খাবার জোগাড় করিয়া সোনার

রেকাব সাজাইয়া রাখেন, আর বনে পেটের ক্ষুধা পেটে মজিয়া যাইবে—কে আপনাকে খাইতে দিবে ?"

কিন্তু খোলের আওয়াজ পুনরায় মধুর এবং স্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠিল ; তাহা এই বুঝাইল—"এই দেহ ক্ষণস্থায়ী,কালই মাথার ঝুঁটি ধরিয়া যমরাজ আপনাকে লইয়া যাইবেন, তিনি যে মহিষের উপর চড়িয়া আসিতেছেন তাহার ঘণ্টা বাজিতেছে, শুনিতে পাইতে-ছেন না ?" আপনি শিশুর মত এই গিল্‌টী করা খেলনা লইয়া মাতিয়া গিয়াছেন এবং যাহা স্থায়ী, যাহা নিত্য, যাহা পরম সম্পদ সেই 'মহাজ্ঞান' হারাইতেছেন।" এইবার খোলের আওয়াজে মীন্‌নাথের আত্মাপুরুষ যেন কাঁপিয়া উঠিল,—তাঁহার চারিদিকের মূল্যবান আসবাব ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার চোখে খড়কুটার মত বোধ হইল। তখন আস্তে আস্তে গোরক্ষ তাঁহাকে ৩২টি প্রশ্ন করিলেন।

তাহার প্রথমটি, "মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায় ?"

আর দ্বিতীয়টি,—"প্রদীপ নিবিয়া গেলে তাহার জ্যোতি কোথায় চলিয়া যায়।"

তৃতীয়টি,—"গান থামিয়া গেলে সুস্বর কোথায় লুকাইয়া থাকে।"

ইহা ছাড়া আর প্রায় সকলগুলি যোগ সম্বন্ধীয়—তাহা আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই।

গোরক্ষনাথ মীনকে আবার 'মহাজ্ঞান' দিতে পারিয়াছিলেন—পুস্তখানির এক নাম 'গোরক্ষ বিজয়' আর এক নাম 'মীন-চেতন'। মীননাথ চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন বলিয়া এই পুস্তকের নাম "মীন-চেতন।"

এই পুস্তকের যতগুলি পুরাণা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সকলগুলিই পূর্ব্ববঙ্গের। সুতরাং সবই যে পূর্ব্ববঙ্গের লেখকগণ লিখিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে "বিক্রমপুরকেই" ধর্ম্মের আদিস্থান বলিয়া লেখা হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১) ময়নামতীর গান

যাঁহারা গোরক্ষনাথের গান রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একদল লোক ময়নামতীর গানও তৈরী করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথের গানে যেরূপ গোরক্ষের মহিমা ও কীর্ত্তির কথা আছে, ময়নামতীর গানে সেইরূপ হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধা এবং তাঁহার শিষ্যা ময়নামতীর সম্বন্ধে নানারূপ ঘটনা লেখা আছে। ময়নামতীর গানেও গোরক্ষনাথের কথা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।

মেহেরকুলের রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা ছিলেন ময়নামতী। তাঁহার শৈশবের নাম ছিল শিশুমতি। মেয়েটির বয়স যখন দশ বৎসর, তখন একদিন গোরক্ষনাথ-যোগী রাজবাড়ীতে উপস্থিত হন, তখন শিশুমতি তাঁহাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা দেখান ও গোরক্ষ যোগী সন্তুষ্ট হইয়া কুমারীকে "মহা-জ্ঞান" শিখাইয়া

দেন এবং তাঁহার নাম রাখেন, "ময়না-সুন্দর" বা 'ময়নামতী'।

বঙ্গের রাজা মাণিকচন্দ্র এই ময়নামতীকে বিবাহ করেন। সেকালের রাজারা এক বিবাহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন না। মানিকচন্দ্র সুন্দরী দেখিয়া আরও অনেকগুলি বিবাহ করেন। ময়নামতী বুড়ী হইলেন, এবং নূতন রাণীরা বয়সের সাথে সাথে দেখিতে খুব সুন্দরী হইয়া উঠিলেন, কাজেই বুড় রাজা সেই ছোট রাণীদের বাধ্য হইলেন। ময়নামতী তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতেন। মাণিকচাঁদ রাজা ময়নাকে রাজবাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন,—তিনি ফেরুসা নামক জায়গায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তোমাদের বলিয়াছি, গোরক্ষনাথের হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধা নামে আর একজন শিষ্য ছিলেন। ময়নামতী ও হাড়িসিদ্ধা একই গুরুর শিষ্য,—সুতরাং তাহাদের মধ্যে খুব ভাব ছিল। ময়নামতী হাড়িসিদ্ধাকে সহোদরের মত ভালবাসিতেন।

একদিন ফেরুসা নগরে ময়না বসিয়াছিলেন, এমন সময় মাণিকচাঁদ রাজার ভাই নেজা আসিয়া খবর দিল,

রাজা ছয়মাস যাবৎ রোগ-শয্যায় পড়িয়া আছেন, তাঁহাকে একবার শেষ-দেখা দেখিতে চান। ময়নামতী আসিয়া রাজাকে খুব কাতর দেখিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার নিকট মহাজ্ঞান শিখিয়া লও, তাহা হইলে মৃত্যুর ভয় থাকিবে না।"

রাজা বলিলেন,—"নিজের স্ত্রীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া জ্ঞান শিখিব?—প্রাণ থাকিতে নয়।"

এদিকে যমদূতেরা উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল, তাহারা ময়নাকে বড় ভয় করিত, কারণ ময়না 'মহাজ্ঞান' জানিত—সে থাকিতে তাঁহারা রাজার প্রাণ লইতে সাহস করিল না। রাজা বলিলেন,—"ময়না, তুমি নিজে গঙ্গা হইতে এক ঘড়া জল লইয়া আইস, আমি তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছি। আমি অন্য কাহারও হাতের জল খাইব না।"

ময়না রাজাকে একা রাখিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা জেদ করিলেন; তখন ময়না লক্ষ টাকা দামের মণিমাণিক্য বসানো গাড়ু হাতে লইয়া গঙ্গার ঘাটে জল আনিতে গেলেন,

ইহার মধ্যে যমদূতেরা আসিয়া রাজার প্রাণ লইয়া গেল।

রাজার প্রাণ যমদূতেরা লইয়া চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া ময়না ঝড়ের মত যমদূতদের পিছনে পিছনে ছুটিলেন। তিনি সাবিত্রীর মত জোড় হাতে যমরাজের পিছু পিছু স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে গেলেন না, একেবারে লাঠি হাতে যমকে মারিয়া ফেলিবার জন্য দাপটে চলিয়া গেলেন। ভয়ে যম চিংড়ি মাছ হইয়া জলের মধ্যে ঢুকিলেন। ময়না পানিকাউড় হইয়া চিংড়ি মাছ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। যম চিল হইয়া আকাশে উড়িলেন। ময়না বাজ হইয়া চিলকে তাড়া করিলেন। যম সাধু সাজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে বসিলেন। ময়না মধুর মাছি হইয়া সাধুর মাথায় হুল ফুটাইলেন। কিন্তু যমকে মারিয়া ধরিয়া কোন ফল হইল না। মাণিক-চাঁদ প্রাণ আর ফিরিয়া পাইলেন না। ধর্ম্মের বরে বুড়ো বয়সে রাণীর এক পুত্র হইল,ইনিই রাজা গোবিন্দ-চন্দ্র বা গোপীচন্দ্র। এই রাজা যখন ছোট ছিলেন, তখন ময়নামতী হাড়িসিদ্ধার মন্ত্রণা লইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। কিন্তু যখন গোবিন্দ্রচন্দ্রের বয়স আঠার

বছর হইল, তখন ময়না তাঁহাকে বলিলেন,—"তোমায় হাড়িসিদ্ধাকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং তাঁহার আজ্ঞায় বার বছরের জন্য সন্ন্যাসী হইয়া রাজধানী ছাড়িয়া থাকিতে হইবে।"

এই অদ্ভুত আজ্ঞা শুনিয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্র একবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন, সেই বয়সেই তিনি কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীদের মধ্যে সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজার মেয়ে অদুনা খুব সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি এবং অপরাপর স্ত্রীরা বিষম ক্ষেপিয়া গেলেন এবং রাণীর সম্বন্ধে নানা খারাপ কথা বলিতে লাগিলেন, হাড়িসিদ্ধার সঙ্গে ময়নামতীর নানা কলঙ্ক দিতে লাগিলেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র মাতাকে বলিলেন,—"তুমি এবং হাড়িসিদ্ধা আমাকে তাড়াইয়া দিয়া এখানে নিরাপদে রাজ্য করিবে এই ফন্দী করিয়াছ। তোমার নামে নানা কথা শুনিতেছি, তুমি হাড়িসিদ্ধার বুদ্ধি লইয়া আমার পিতাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছ। যদি তুমি খুব ভাল হইতে, তবে আমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত সহমরণে গেলে না কেন? আমি নীচ হাড়ি-বেটার নিকটে কিছুতেই মন্ত্র

লইয়া তাহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। সে হাট-বাজারে নর্দ্দামা পরিস্কার করে, আমি এত বড় রাজা হইয়া সেই হাড়ি বেটার পায়ে প্রণাম করিতে পারিব না।”

রাণী বলিলেন,—“তোকে আমি বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছি, তুই ছেলে হইয়া এরূপ কদর্য্য কথা আমাকে বলিতেছিস্! তুই জন্মিয়াই মরিলি না কেন? হাড়ি সিদ্ধা আমার গুরু-ভাই, তাহার শক্তির কথা তুই কিছুই জানিস না। সে খড়ম পায়ে দিয়া নদী পার হয়; ইন্দ্রের পুত্র মেঘনাদ তাহার মাথায় ছাতি ধরে; সে চাঁদের পিঠে রান্না করিয়া খায়; ইচ্ছা হইলে চাঁদ আর সূর্য্যকে কুণ্ডল করিয়া দুই কানে পরে; সে যমের ঝুঁটি ধরিয়া লইয়া আসে—তার আরও কত কি শক্তি আছে, তুই তাকে চিন্‌লি না। আর তোকে সন্ন্যাসী করিয়া বনে পাঠাইলে কি আমি সুখে থাকিব? তুই আমার একমাত্র ছেলে। আমার গুরু বলিয়াছেন, তুই ১৮ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া যদি ১২ বছর রাজ্য হইতে দূরে না থাকিস্, তবে তোর আয়ু আর বেশী নাই। ১৯ বছরে পা দিতে দিতে তোর মৃত্যু হইবে। আমি

তোর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া বড় দুঃখে বুক বাঁধিয়া তোকে বনে পাঠাইতেছি। আর তুই যে বলিলি, আমি তোর পিতার সঙ্গে সহমরণ যাই নাই। এ কথা ঠিক নয়, আমি তোর পিতার জ্বলন্ত চিতায় চড়িয়াছিলাম। কিন্তু মহাজ্ঞান থাকাতে আমার মৃত্যু হয় নাই।"

স্ত্রীদিগের পরামর্শে গোবিন্দ রাজা বলিলেন, "আচ্ছা দেখি, তোমার মহাজ্ঞান কিরূপ! তোমাকে তপ্ত তৈলের কড়ার মধ্যে ফেলিব! দেখি তুমি কিরূপে রক্ষা পাও।"

উত্তপ্ত ৮০ মন তৈলের কড়ার মধ্যে রাণীকে ফেলা হইল। সাত দিন ক্রমাগত অগ্নি জ্বাল হইয়া সেই তৈল ফুটিতে লাগিল—কিন্তু ময়নার এক গাছি চুলও পুড়িল না, গায়ে একটা ফোস্কাও পড়িল না। অদুনা প্রভৃতি স্ত্রীরা নানারূপ বুদ্ধি করিয়া ময়নামতীকে বিষ কিনিয়া সন্দেশের মধ্যে ভরিয়া খাওয়াইল—মহাজ্ঞানের বলে ময়না বাঁচিয়া উঠিলেন।

তখন গোবিন্দচন্দ্র রাজা সন্ন্যাসী হইলেন। ১২ বছর হাড়িসিদ্ধার উপদেশে নানা স্থানে ঘুরিয়া হীরা-নটীর চাকর হইলেন। হীরা গোবিন্দচন্দ্রের অপূর্ব্ব সুন্দর

মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নানারূপ অত্যাচার সহ্য করিয়াও গোবিন্দচন্দ্র খাঁটি রহিলেন, তাঁহার চরিত্রের কোন দোষ ঘটিল না।

বার বছর পরে যখন জটা মাথায়, বাকল-পরা রাজা উস্ক শুষ্ক মুখে নিজ রাজ-বাড়ীর অন্দরে ঢুকিতে চেষ্টা করিলেন, তখন অদুনা তাহাকে চিনিতে না পারিয়া রাজ-বাড়ীর প্রকাণ্ড কুকুর লেলাইয়া দিয়া তাড়া করিলেন. কুকুর স্বীয় প্রভুকে চিনিতে পারিয়া আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল। অদুনা প্রকাণ্ড রাজহস্তীটাকে লেলিয়া দিলেন,—অচেনা অতিথকে পায়ে দলিয়া মারিতে। হাতী স্বীয় প্রভুকে চিনিতে পারিয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া শুঁড় ঘুরাইয়া প্রণাম জানাইল ও তার দুই চোখের জল পড়িতে লাগিল। তখন হঠাৎ অদুনা স্বামীকে চিনিতে পারিলেন, বার বছর শেষ হইয়াছে—সে কথা মনে পড়িল। তখন নীচে নামিয়া আসিয়া মাথার চুল দিয়া গোবিন্দচন্দ্রের পা দুখানি যেন বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন "প্রভু, অবোধ পশুরা তোমাকে চিনিল আর তোমার হতভাগিনী রাণী তোমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে।"

(২) শূন্য পুরাণ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বুদ্ধকে ছোট লোকেরা ধর্ম্মঠাকুর বলিয়া পূজা করিত। রমাই পণ্ডিত একজন ধর্ম্ম-পূজার প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ইনি ধর্ম্মপালের সময় বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং ইং ১০।১১ শত সনের মধ্যে কোন সময়ে তিনি জন্মিয়াছিলেন। শূন্য পুরাণ রমাই পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন। ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরকে কি ভাবে পূজা করিতে হয়, তাহার সম্বন্ধে খুঁটি নাটি অনেক কথা আছে। সৃষ্টি কেমন করিয়া হইল, সৃষ্টির প্রথমে নিরঞ্জন প্রভুর কিরূপ উৎপত্তি হইল এবং তাঁহার বাহন উলুক কি কি করিলেন, সে সকল কথা এই পুস্তকে আছে। সর্ব্বপ্রথম শিবঠাকুর ধর্ম্মকে পূজা করেন। তিনি কোনও সময় উলঙ্গ থাকেন, কোনও সময় দুর্গন্ধ বাঘছাল পরেন, কোনও সময়ে ভিক্ষা করিয়া চাল পান, কখন শুধু হরতকী খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন, কখনও বা উপোস করেন। এই সকল দেখিয়া এক ভক্ত তাঁহাকে চাষ করিয়া ধান বুনিতে বলিতেছেন, কাপাস বুনিয়া তুলো তৈরী করিয়া সূতোর

কাপড় তৈরী করিতে বলিতেছেন এবং তিনি ছাই মাখিয়া শরীরটা একবারে খর্‌খরে করিয়া ফেলিয়াছেন, দেখিয়া ভক্ত তাঁহাকে তিল বুনিয়া তৈল বানাইতে অনুরোধ করিয়া কান্না কাটি করিতেছেন—এই সকল কথাও শূন্য পুরাণে আছে। ইহা ছাড়া হনুমান ধর্ম্ম-মন্দিরের কোন্ কোন্ দ্বার রক্ষা করেন, সেতাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত কোন্ দ্বার রক্ষা করেন, তাহাও আছে। মীননাথ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি সাধুগণের নাম জায়গায় জায়গায় উল্লেখ আছে। এই পুস্তকের কতক অংশ কবিতায়, আর কতকাংশ গদ্যে লিখিত হইয়াছে। সাপের মন্ত্র ছাড়া এই সকল গদ্য হইতে পুরাণ বাঙ্গলা গদ্য আর কোথায়ও পাওয়া যায় না।

শূন্য পুরাণের ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এক এক জায়গায় ঠিক পুরাণ সেই আদিকালের ভাষা আছে, যথা—

"একল রমাই পণ্ডিত সকল অবধান" ইহার অর্থ "একা রমাই পণ্ডিতকে সকলটির তুল্য বলিয়া জানিও।"

ধর্ম্মঠাকুর যে বুদ্ধদেব ভিন্ন আর কেহ নন, এই পুস্তকের জায়গায় জায়গায় তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

এক স্থানে আছে "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" জয়দেব বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে স্তব লিখিয়াছেন—তাহাতে বুদ্ধদেবের পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন,—"বুদ্ধদেব যজ্ঞের নিন্দা করেন।"

শূন্য পুরাণের আর এক স্থলে আছে—"সিংহলে শ্রীধর্ম্মরাজের বহুত সম্মান" সকলেই জানেন সিংহলে বৌদ্ধদের সংখ্যা খুব বেশী।

শূন্য পুরাণের শেষের দিকে জাজপুরে মুসলমানের অত্যাচারের কথা আছে, সে অংশটা রামাই পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয় না, বোধ হয় শেষে কোন লেখক উহা শূন্য পুরাণে জুড়িয়া দিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ডাক ও খনার বচন

এই সকল বচন যে কতকালের, তাহা ঠিক বলা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম যে সময় প্রবল ছিল, তখন ভক্তির উপর ততটা জোর দেওয়া হইত না, পূজা-আহ্নিক জপ, তপ এই সকলের ততটা ঘটা ছিল না। ব্রাহ্মণেরা যখন হিন্দুধর্ম্মকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া ফেলিলেন, তখন জপ-তপ লইয়া লোকেরা ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ডাক ও খনার বচনে জপ-তপের কথা বিশেষ দেখা যায় না। জীবে দয়া, মহোৎসব, পুকুর-কাটা প্রভৃতি ছিল, বৌদ্ধ-যুগের প্রধান ধর্ম্ম।

ডাক ও খনার বচনে ঐ সকল কাজের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে—সুতরাং মনে হয় এই বচনগুলি হিন্দুধর্ম্মের নূতন রূপ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেকার রচনা, —যদিও ইহাদের ভাষার খুব একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তথাপি মাঝে মাঝে এমন শক্ত পুরাণা ভাষার নমুনা

পাওয়া যায় যে তাহার অর্থ ভাল করিয়া বোঝা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ—

"আদি অন্ত ভূজসি।
ইষ্ট দেবে যেহ পূজসি॥
মরণের যদি ডর বাসসি।
অসম্ভব কভু ন খায়সি॥"

এই বচনগুলি কে রচনা করিয়াছিল তাহা ঠিক নির্ণয় করা শক্ত। আসামবাসীরা বলেন,—ডাক নামক এক ব্যক্তি আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে লোহিডাঙ্গরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই "ডাকের বচন" রচনা করেন। বাঙ্গালা দেশের প্রবাদ এই যে, বরাহ পণ্ডিতের পুত্র-বধু খনা "খনার বচন" লিখিয়াছিলেন। এ সকল কথা প্রবাদ-কথা মাত্র, উহা সত্য বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের ধারণা বাঙ্গালা দেশের কৃষকেরা, পাড়াগাঁয়ের জ্যোতিষীরা এবং বুড় গিন্নিরা যে সকল ছড়া তৈরী করিয়া মুখে মুখে চালাইয়া আসিয়াছেন, তাহাই ডাক ও খনার বচন নামে দেশে প্রচলিত হইয়াছে। হয়ত পূর্ব্বোক্ত দুই জ্ঞানী ব্যক্তির কোনকালে দু' চারটা

ছড়া ছিল, তাহার আদত ভাষা কি ছিল, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তাহার সঙ্গে যুগে যুগে গ্রামের শত শত ছড়ার সংযোগ হইয়া এখন মস্তবড় আকার ধারণ করিয়াছে।

এই সকল বচনে ছোট খাট কথায় অনেক জ্ঞানের কথা আছে,—

"খণ্ড খণ্ড আকাশ,
এলো থেলো বাতাস,
কি কর শ্বশুর বাঁধ আইল,
বৃষ্টি হবে আজ কাইল।"

এখানে খনা তাঁর শ্বশুর বরাহকে সম্বোধন করিয়া ছড়াটি বলিতেছেন। যখন বাতাস এদিক ওদিক সকল দিক হইতেই বহিতেছে—কোনও একটা বিশেষ দিক হইতে আইসে নাই, যখন আকাশের মেঘ খণ্ড খণ্ড,—একটা বড় রকমের আকার ধরিয়া রহে নাই, তখন খনা শ্বশুরকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—"শ্বশুর মহাশয় ক্ষেতে আইল বাঁধুন, এইবার বৃষ্টি হইবে—জল ধরিয়া রাখিতে হইবে।"

"খনা ডেকে ব'লে যান,
রোদে ধান ছায়ায় পান।"

যত রোদ বেশী পাইবে, ততই ধান বাড়িবে, আর যতই ছায়া বেশী হইবে, পান ততই গজাইবে।

"যদি বরে আগনে।
রাজা নামেন মাগনে॥
যদি বরে পোউষে।
কড়ি হয় তুষে॥
যদি বরে মাঘের শেষ।
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ॥
যদি বরে ফাগুনে।
চিনা কাওন হয় দ্বিগুণে॥

এত সংক্ষেপে এত সহজে এরূপ সত্য যাঁরা বলিতে পারিয়াছিলেন, তাঁরা অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে। আগণ মাসে বৃষ্টি হইলে ধান চালের অবস্থা এত খারাপ হয়,যে রাজাকেও খাজনা না পাইয়া ভিক্ষায় নামিতে হয়; পৌষে বৃষ্টি হইলে ধান একবারে নষ্ট হয়, তখন তুষেরও দাম হয়, মাঘের শেষে বৃষ্টি

হইলে ফসল খুব বেশী হয়—ফাগুনের বৃষ্টিতে চিনা-কাওন দ্বিগুণ হয়।

সংসার গৃহস্থালীর সকল দিক দিয়াই এইরূপ ছোট ছোট কথায় মস্ত মস্ত সত্য প্রচার করা হইয়াছে। বাড়ী করিবার সম্বন্ধে ছুচারি কথায় এইরূপ উপদেশ আছে—যাহা লিখিতে যাইয়া এখনকার দিনে ইঞ্জিনিয়ারগণ বড় বড় বই তৈরী করিয়া ফেলিতেন—

"পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।
উত্তর ঘিরে, দখিণ ছেড়ে,
বাড়ী কর্‌গে, ভেড়ের ভেড়ে।"

শেষের কথাটা গালাগালি, সেটা সেকালের দস্তুর,—এখন হইলে বলা হইত,—"ওরে বোকা শোন্‌, বলছি—" ভেড়ের ভেড়ে মানে এই। পূবে হাঁস অর্থ পুকুর থাকিবে—সেখানে স্বচ্ছন্দে হাঁস জলের উপর বেড়াইয়া বেড়াইবে। পশ্চিম দিকে বাঁশের ঝাড়—সেটা গৃহস্থের সম্বলও বটে এবং পশ্চিমের রোদটা খুব ভাল নয়, বাঁশবনে একটু বাধা পাবে—অথচ রোদটা একবারে বন্ধ করাও ঠিক নয়। উত্তরটাতে কিন্তু গাছ

দিয়ে হউক, প্রাচীর দিয়ে হউক একবারে ঘিরিয়া ফেলাই ভাল—উত্তরে হাওয়া ভাল নয়। দক্ষিণটা খোলা রাখিতে হইবে।

এইরূপ শত শত বচন আছে। এক একটী ছোট ছড়া যেন এক একখানি ছোট শাস্ত্র। বাঙ্গালা পুরাণা কথায় লেখা হইয়াছে বলিয়া অমান্য করিও না, সংস্কৃত কি ইংরেজীতে লেখা হইলেও ইহাদের মূল্য বাড়িত না।

ডাকের বচনে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে কথাই বেশী আছে। যথা—

ঘরে আখা বাইরে রাঁধে।
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥
পাণি ফেলিয়া পাণিকে যায়।
পুরুষের দিকে আড়চোখে চায়॥
ঘন ঘন চাহে উলটি ঘাড়।
ডাক কহে এ নারীতে ঘর উজাড়॥

ঘরে উনুন থাকিতেও যে বাহিরে রান্না করে,—মাথায় চুল বেশী নাই, তবু তাহা খুব ফুলাইয়া বাঁধে,

জল ঘড়ায় আছে, সে জল ফেলিয়া দিয়া জল আনিবার ছলে পুকুরে যায়, আর ঘন ঘন বাইরের লোকের দিকে ঘাড় উল্‌টিয়া দেখিতে থাকে—এইরূপ স্ত্রী সংসার নষ্ট করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাসুন্দর

তোমরা অবশ্যই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নাম শুনিয়াছ। ভারতচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধের ৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৫২ সনে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। দেড়শ বছরের অধিক হইয়া গিয়াছে,—এই পুস্তক লেখা হয়, কিন্তু এই বিদ্যাসুন্দরই একমাত্র বিদ্যাসুন্দর নহে। ইহার পূর্ব্বে কুমার হট্ট নিবাসী রামপ্রসাদ সেন, যাঁর মালশী গান তোমরা হয়ত শুনিয়াছ, তিনি একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, কিন্তু ইহারও পূর্ব্বের বিদ্যা-সুন্দর পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার নিকটস্থ নিমতা গ্রামবাসী কৃষ্ণরাম নামক এক কবি ইং ১৬৮০ সনে একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, কিন্তু ইহারও ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহের কঙ্ক কবি আর একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। কঙ্ক চৈতন্যদেবের সময় জীবিত ছিলেন। সুতরাং কঙ্ক কবি, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র—ইঁহারা ক্রমান্বয়ে বিদ্যাসুন্দর

রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের পরে প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী ও অপর দুই একজন কবি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন।

মাত্র ইহাঁরাই যে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন এমন নহে, খুব সম্ভব কঙ্ক কবির পূর্ব্বেও আরও কয়েকখানি কাব্য লিখিত হইয়াছিল। অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক বিদ্যাসুন্দর পাওয়া যাইবার কথা—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার বর্ণিত গল্পটি এইরূপ :—

গুণবন্ধু রাজার পুত্র সুন্দর বর্দ্ধমানাধিপতি বীরসিংহ রায়ের কন্যা বিদ্যার রূপ গুণের কথা শুনিয়া এবং তাঁহার ছবি দেখিয়া নিতান্ত মুগ্ধ হন, এবং নিজের পরিচয় গোপন করিয়া বর্দ্ধমানে আসিয়া বিদ্যার সন্ধানে ঘুরিতে থাকেন। বিদ্যার এই পণ ছিল, যিনি তাঁহাকে বিচারে জয় করিতে পারিবেন, ইনি তাঁহাকেই স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবেন,—বর্দ্ধমানে রাজবাড়ীর মালিনী হীরার বাড়ীতে সুন্দর বাস করিতে লাগিলেন এবং কালী-দেবীর বরে সিঁদকাঠির দ্বারা একটা সুড়ঙ্গ কাটিয়া বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হন, তথায় বিচারে পরাস্ত করিয়া গন্ধর্ব্ব মতে বিদ্যাকে বিবাহ করেন। এই ঘটনা প্রকাশ পাইল, রাজা কোটালের উপর খুব

বকুনি দিতে লাগিলেন,—এবং কোটাল নানারূপ চেষ্টা করিয়া সুন্দরকে ধরিয়া ফেলিল। রাজা দক্ষিণ মশানে তাঁহার মাথা কাটিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু সুন্দর কালীর স্তব পড়িয়া এই বিপদে জগন্মাতার সাহায্য চাহিলেন। তখন কালী ভূত প্রেত পাঠাইয়া রাজসৈন্যের মধ্যে মহামারি উপস্থিত করিলেন এবং রাজাও স্বপ্নাদেশ পাইলেন। ইহার মধ্যে গঙ্গা ভাট আসিয়া সুন্দরের পরিচয় দিল, তিনি কাঞ্চীপুরের রাজা গুণবন্ধুর পুত্র। তখন বীরসিংহ বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ দেওয়াইলেন।

— —

নবম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগ ও পরযুগ

আমরা পূর্ব্বের পরিচ্ছেদে যে সকল কাব্যের কথা লিখিয়াছি—তৎসম্বন্ধে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ঐ সমস্ত কাব্যই হিন্দুধর্ম্মের নূতন আকার ধারণ করিয়া এই দেশে প্রভাব বিস্তার করিবার পূর্ব্বে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হয় ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পর। হিন্দু-জনসাধারণের উপর এই সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দূর হয় এবং নূতন হিন্দুধর্ম্মের অধিকারের আরম্ভ হয়।

যতগুলি কাব্যের কথা বলা হইয়াছে, সবগুলিরই আরম্ভ মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে।

কাণা হরিদত্ত নামক এক কবি ইংরাজী ১২০০ সালের কাছাকাছি সময়ে একখানি মনসা মঙ্গল লিখিয়াছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু কাণা হরিদত্তের পূর্ব্বেও "মনসা-মঙ্গল" ছিল বলিয়া মনে হয়।

চণ্ডী কাব্যের লেখক মাণিক দত্ত ইংরাজী ১২০০ সালের পরে চণ্ডী-মঙ্গল লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহার পূর্ব্বেও "চণ্ডী-মঙ্গল" ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে সারারাত্রি ধরিয়া চণ্ডী মঙ্গল গীত হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল কাব্য সম্ভবতঃ একজনের লেখা ছিল না, মাণিকদত্ত তাঁহাদের একজন কবি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যও বহু প্রাচীন।

গোরক্ষ বিজয়, গোবিন্দচন্দ্র বা ময়নামতীর গান, ডাক ও খনার বচন, ধর্ম্ম-মঙ্গল, সূর্য্যের গান, মহী-পালের গান, শিবের গান, ব্রতকথা, গীতিকথা প্রভৃতি সমস্ত কাব্যই বহু প্রাচীন। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে, বৌদ্ধপ্রভাবের সময়, হিন্দুধর্ম্মের নূতন জাগরণের পূর্ব্বে এই সকল কাব্য ও কথা লিখিত হইতে সুরু হইয়াছিল।

এক বিষয়ে যদি কবিরা ক্রমান্বয়ে লিখিতে থাকেন, তবে শেষের কবিরা সহজে বেশী মর্য্যাদা পাইতে পারেন, কারণ পূর্ব্বের কবিদিগের কবিত্ব তাঁহারা হাতে পান, তাহার উপর নিজের কবিত্ব ফলাইয়া নিজের

কাব্যের উন্নতি সাধন করিতে পারেন। এইজন্য কবিকঙ্কণ যখন চণ্ডী লিখিলেন, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডী-গুলির লোপ পাইয়া গেল। খুব সুন্দর একখানি নূতন কাব্য হাতে পাইলে পাঠকেরা পূর্ব্বের কবিদিগকে কেন মনে রাখিবেন? এইভাবে বিজয়গুপ্ত ও কেতকাদাস—ক্ষেমানন্দের প্রভাবে কাণা হরিদত্ত প্রভৃতি কবিরা ম্লান হইয়া লোপ পাইয়া গেলেন।

সুতরাং যদিও হিন্দুধর্ম্মের নব-জাগরণের পূর্ব্বে এই সকল কাব্যের অনেকগুলিরই খসড়া লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি এখন আমরা সেই সকল বিষয় লইয়া যে সব উৎকৃষ্ট কাব্য পাইতেছি, তাহা পরের সময়ের লেখা, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের নব-জাগরণের চিহ্নই স্পষ্ট। কিন্তু এই সকল কাব্য ও কথা যে বহু প্রাচীন, তাহা সন তারিখ ও ভাষাগত প্রমাণের বাহুল্য না পাইলেও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি।

ব্রাহ্মণ্য বা নব-হিন্দুধর্ম্মের প্রধান প্রমাণ—ব্রাহ্মণ দিগের মাহাত্ম্য প্রচার। কিন্তু ঐ সকল প্রাচীন কাব্য-কথায় ব্রাহ্মণের পদ খুব গৌরবজনক নহে। চণ্ডী কাব্যে দেখা যায় ধনপতি সদাগর বাণিজ্য-যাত্রা

ঠিক করিয়া যে দিনটা দেখিলেন,—পুরোহিত ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল,—সে যাত্রার পক্ষে দিনটা ভাল নয়। তারপর—

> "এমন শুনিয়া সাধু মুখ করে বাঁকা।
> নফরে আদেশ করি মারে তারে ধাকা॥"

এখন কি কেহ কল্পনা করিতে পারেন যে একটা বেনের ছেলে বামুনকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া দিন দেখিয়া যাহা ভাল তাহাই বলার অপরাধে নফর দিয়া ধাকা মারিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে সাহস করিতে পারে?

আরও দেখা যায় শ্রীমন্ত সদাগর এক ব্রাহ্মণের টোলে সংস্কৃত পড়িতেছেন। সে ব্রাহ্মণ অবশ্য এখনকার দিনের ব্রাহ্মণ কখনই নয়। টোল তো দূরের কথা সংস্কৃত কলেজে সেদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন অপর কোন জাতির প্রবেশাধিকার ছিলনা।

ব্রাহ্মণের পৈতা সর্ব্বদা না পরিলেও চলিত। ময়নামতীর গানে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ পৈতা চাদরের মত ঘরের এক জায়গায় টাঙ্গাইয়া রাখিতেন, রাজসভায় যাওয়ার সময় পরিয়া যাইতেন। বিজয়গুপ্তের পদ্ম-

পুরাণে দেখা যায় মুসলমান পাইকেরা বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল ব্রহ্মণকে ধরিয়া লইয়া গেল—যাহাদের গলায় পৈতা ছিল; সুতরাং অনেক ব্রাহ্মণ এমনও ছিলেন, যাহাদের গলায় পৈতা ছিল না। আমরা কুলজ্ঞদের মুখে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে শুনিয়াছি—

"পৈতা ছাড়ি পৈতা লয় বৈদিকে দেয় পাতি।"

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা সেন রাজাদিগকে গ্রাহ্য করিতেন না, সেন রাজারাই নূতন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। এমন কি চৈতন্যপ্রভুর সময়ও ব্রাহ্মণেরা পৈতার যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেন। চৈতন্য স্বয়ং পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ গলা হইতে পৈতা খুলিয়া নিজের স্ত্রী লক্ষ্মীকে দিয়া গিয়াছিলেন। নেপালে এখনও যে সকল ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কাজ করেন, কেবল তাঁহারাই পৈতা গলায় সর্ব্বদা রাখেন, অপর ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করিবার সময় পৈতা গলায় পরিয়া শেষে তাহা ত্যাগ করেন। বোধ হয় এইজন্যই পৈতার নাম যজ্ঞোপবীত।

চণ্ডী, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেখা যায়

ব্রাহ্মণগণের কোন প্রভাবই নাই—কাব্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও নায়ক নায়িকা—বেনে জাতীয়। বেনেরাই বৌদ্ধ-যুগের বড়লোক ছিলেন। গীতি-কথাগুলিতে দেখা যায় যে সদাগরের ছেলেরা রাজপুত্রদের সমকক্ষ। রাজপুত্র এবং সদাগরের পুত্র প্রাণে প্রাণে বন্ধু, সদাগরের পুত্রেরাই অনেক সময় রাজকন্যাদের বর। এই সকল কাব্য ও কথায় জাতিভেদের আঁটাআঁটি কিছুমাত্র দেখা যায় না। বেনের ছেলে শ্রীমন্ত শালী-বাহন ও বিক্রমশীল এই দুই ক্ষত্রিয় রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সমুদ্রযাত্রা নিষেধ হওয়ার পরে বেনে জাতির অবনতি সুরু হয়, তদবধি ইহাঁদের সামাজিক খর্ব্বতা হইয়াছে। শুধু বেনে জাতি নহে, চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ জাতীয় কালকেতুও কাব্য-নায়ক। ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের নব-জাগরণের পর এরূপ কাব্য কল্পিত হইতে পারিত না।

যদি কেহ একথা বলেন যে এই সকল কাব্যের অনেকগুলিই তো পরবর্ত্তী যুগে নূতন করিয়া লিখিয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব—সেগুলিতে তাঁহারা এ সকল কথা থাকিতে দিলেন কেন? তাহার

উত্তরে আমরা এই বলিব—যে পুরাতন জিনিষের খোল ও নলিচা সমস্ত পরিবর্ত্তন করা চলে না। সাধারণ লোক যে সকল কথা চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছে, ধর্ম্ম-উৎসবে যাহা চিরকাল গাওয়া হইয়াছে, তাহা অন্যরূপ করার উপায় ছিলনা, লোকে মনগড়া নূতন কথা শুনিবে কেন? এইজন্য প্রাচীন খসড়া তাঁহারা বদলাইতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা ভাষা সহজ করিয়াছেন, শুনিতে মিষ্ট ও সহজ সংস্কৃত কথার আমদানী করিয়াছেন; স্থানে স্থানে ভক্তির কথা আনিয়াছেন, একরূপ কাঠামো ঠিক রাখিয়া চাল-চিত্র করিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত।

৫। এই সকল কাব্য ও কথা যতটা প্রচীন, ততটা তাহাদের মধ্যে সমুদ্র যাত্রার বিবরণ সুস্পষ্ট। বংশীদাস বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি কবির সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ খুব যথাযথ ও সুন্দর। কবিকঙ্কণের সময় সমুদ্রযাত্রা ছিলনা, সুতরাং তাঁহারা এই সকল বিবরণ অনেকটা গল্পের মত,—তাহা বিশ্বাস করা যায় না। গীত-কথা ও ব্রতকথায় সমুদ্র যাত্রার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য—সেগুলি পড়িলে অনেক ঐতিহাসিক কথা জানিতে

পারা যায়। একটি গল্পে আছে,—কর্ণধার সমুদ্রযাত্রার পূর্ব্বে সদাগরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"আপনি পিতা-মাতা ও স্ত্রীর অনুমতি পাইয়াছেন কি? যাঁহাদের রাখিয়া গেলেন, তাঁহাদের জন্য দীর্ঘকালের সংস্থান করিয়াছেন কি? দেবালয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে কি?" —ইত্যাদি। সমুদ্রযাত্রার পূর্ব্বে কি কি ধর্ম্ম কার্য্য করিতে হইত, তাহার উল্লেখ কাঞ্চনমালার গল্পে আছে। জাহাজগুলিতে তৈল সিন্দূর কিরূপ মাখাইতে হইত, মাস্তুল, গলুই, কিরূপে সাজাইতে হইত, সারা দিন রাত্তি পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবার কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইত; জাহাজের কার্য্য-কর্ত্তাদের ও মাঝিদের কি কি উপাধি ছিল,—তাহা আমরা এই সকল গীতি-কথায় পাইতেছি।

ব্রতকথার মধ্যে কুমারী মেয়েরা আকাশে দুর্য্যোগ দেখিলে সমুদ্রযাত্রী ভাই ও পিতার জন্য কিরূপ আকুল হইয়া প্রার্থনা করিত, তাহা অতি সকরুণ ভাবে লিখিত হইয়াছে। আকাশে বক দেখিলে কচি হাত তুলিয়া তাহারা বলিত, "হে বক, আমাদের পিতা ও ভাইদের খবর দিয়া যাও।" নদীকে ডাকিয়া বলিত, "আমাদের

বাপ ভাইকে নিরাপদে আনিয়া বাড়ী পৌছিয়া দিয়া যাও।" ডিঙ্গাগুলিকে করযোড়ে বলিত, "তোমরা তো নানা জায়গায় যাও, আমাদের বাপ ভাই কেমন আছে বলিয়া দাও।"

কতকগুলি কথা এই যুগের সমস্ত কাব্যেই একভাবে পাওয়া যায়। কতকগুলি ছোট ছোট উপমা পাড়াগাঁয়ের লোকেরা যাহা রোজ কথায় ব্যবহার করে,—তাহাই একই ভাবে সকল পুস্তকেই দেখা যায়।'প্রদীপ নিবিয়া গেলে তৈল দিয়া কি হইবে',—'ক্ষেতের জল গেলে শেষে আইল বাঁধিলে কি হইবে'—কথায় কথায় চলিয়া এই ভাবের ছড়া আছে। দুধের পাহারা বিড়াল,—কচু বনের পাহারা শূকর,—এইরূপ উপমা দিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। বানিয়ার কৌটায় সিন্দুর রাখিয়া দিলে তাহা নিরাপদ হয়,—এই কথাটা যেমন ময়নামতির গানে পাইতেছি, তেমনই গীতি-কথায়ও পাইতেছি। সরল গ্রাম্য উপমা গোরক্ষবিজয়, গোবিন্দ চন্দ্রের গান, গীতিকথা, ব্রতকথা এই সকল পুস্তকেই একই ভাবে পাওয়া যাইতেছে।

সংস্কৃত শব্দ এই সকল কাব্যে খুবই কম।

ইহার পরে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহাতে রাশি রাশি সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃতের উপমা পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকের মুখ বর্ণনা করিতে হইলেই কবিরা চন্দ্রের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন, ঠোঁটের শোভা বলিতে গেলেই দাড়িমের বীজ কি পাকা তেলাকুঁজ (বিম্ব) লইয়া উপমার তৈরী করিয়াছেন, তাহা ছাড়া গৃধিণীর ঠোঁটের সঙ্গে নাকের, মেঘের সঙ্গে চুলের, নাকের ডগার সঙ্গে তিল ফুলের, ভুরুর সঙ্গে ফুলধনুর, গতির সঙ্গে মত্ত হাতীর গমন-ভঙ্গীর, গ্রীবার সঙ্গে রাজহংসের কণ্ঠের, খোঁপার সঙ্গে চামরের, হাতের সঙ্গে মৃণালের এই ভাবের শত শত উপমা সংস্কৃত হইতে কবিরা বাঙ্গলা-ভাষায় আমদানী করিয়াছেন। পুরুষের দুই বাহু বুঝাইতে তারা সকলেই আজানুলম্বিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, দুই চক্ষু পদ্ম-পলাশের সঙ্গে উপমা দিয়া "আকর্ণ বিস্তৃত" শব্দের দ্বারা তাহাদের গৌরব বাড়াইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের প্রভাবান্বিত বাঙ্গলা-সাহিত্যে এইরূপ সংস্কৃতের শব্দ ও ভাবের ছড়াছড়ি দৃষ্ট হয়। এগুলি একরূপ বাঁধিগৎ হইয়া পড়িয়াছিল। কবিরা স্ত্রীপুরুষ কাহারও রূপবর্ণনা করিতে গেলে

সচরাচর যেরূপ স্ত্রীপুরুষ দেখা যায়, তাহাদের দিকে একবারেই দৃষ্টি করিতেন না—সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল রূপ বর্ণনা পড়িয়াছিলেন তাহাই চোখ বুজিয়া আওড়াইয়া যাইতেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ-প্রভাবের আগেকার যুগের সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের জায়গায় ছোট ছোট সহজ গ্রাম্য কথা পাওয়া যায়, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন মান্য করেন নাই; আবার ছোট ছোট গ্রাম্য উপমা দিয়া কবিরা তাঁদের বর্ণনাগুলি স্পষ্ট করিয়া গিয়াছেন। গোপীচন্দ্র তাঁহার স্ত্রী অদুনার দাঁতের শোভা বলিতে যাইয়া কহিয়াছেন, দাঁতগুলি সোনার ন্যায় ধব্‌ধবে সাদা। এই কথায় দুইটী জিনিষ মনে হয়, প্রথমতঃ তখনও মুসলমান প্রভাবের ফলে দাঁতের মাজনের ব্যবহারের চলন হয় নাই, এবং পান খাওয়ার রীতিটা খুব বাড়াবাড়ি রকমের ছিল না। হীরা নটীর দাসী তাহাকে যাইয়া বলিতেছে, "রাজপুত্রের রূপের কথা তোমায় কি বলিব? তাঁহার পায়ে যে রূপ আছে, তোমার মুখে তা' নাই।" গীতিকথায় রাজকন্যার চুলের বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন;

"অঘোরে ঘুমায় কন্যা এলোথেলো বেশ।
সারাটি পালঙ্ক জুড়ে ছড়িয়া আছে
দীঘল মাথার কেশ।

রূপবর্ণনা এইরূপ!

সে সকল সহজ কথা, সরল উপমা ও প্রাণের কথা লইয়া আদি-যুগ চলিয়া গেল। দ্বিতীয় অর্থাৎ সংস্কৃতের যুগে রূপ বর্ণনা হইল এইরূপ ঃ—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥

অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ-রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥

দেখ উরু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥

ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগকর বাহু সুবলিত॥

কাশীদাস।

৭। আদিযুগের কবিতায় স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা পাড়াগেঁয়ে ধরণের; ভোগ জিনিষটার উপরই বেশী দৃষ্টি, প্রেমটা তাদৃশ রুচি-শুদ্ধ ছিল না। সেই ভালবাসায় হিংসা দ্বেষ, কথা কাটা-কাটি খুবই বেশী, বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ে এখনও অনেক ঘরে তার নমুনা পাওয়া যায়। ঝগড়া করিতে গেলে তাদের সাধু-ভাষা জুটিত না, খুব রয়ে সয়ে কথা বলবার তাদের সাধ্য ছিল না—তারা ভদ্রভাবে দুই একটি চোখা কথায় বক্ষ ভেদ করিবার মত অস্ত্রের ব্যবহার জানিত না—রাগ হইলে ঝড়ের মত কথার লহর ছুটিত—ভাল মন্দ নানা কথাই বলিয়া ফেলিত। এখন আমরা সে সকল কথা বলিতে লজ্জা বোধ করি, সেকালের লোকেরা তাহা বলিতে কোনই লজ্জা বোধ করিত না। সুতরাং সমাজের যখন ভিন্নরূপ রুচি ছিল তখন এখনকার সঙ্গে তার মোটেই তুলনা চলে না। সে কালের হর-পার্ব্বতীর কোন্দল, মনসাদেবীর প্রতি চণ্ডীর ব্যবহার, ভুমুনী লইয়া শিবের সঙ্গে পার্ব্বতীর বচসা—এ সকল বর্ণনা এখনকার সভ্যতার কোন ধার ধারে না।

৮। সে যুগে কৃষিই ছিল গৃহস্থের প্রধান অবলম্বন,

এ জন্য ডাকের ও খনার বচন হইতে সুরু করিয়া, শূন্য-পুরাণ এমন কি রামেশ্বরের শিবায়ণ পর্য্যন্ত সকল কাব্যেই কৃষি সম্বন্ধে বিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়; সে গুলি একরূপ সারতত্ত্ব। বাঙ্গলার আবহাওয়ায় কোন সময় কিরূপ ফসল হয়, বাঙ্গলার ক্ষেত চষিয়া চাষারা যে কি সোণার ফসল সৃষ্টি করিত, ধান চালের যে কত ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল! সেগুলি পড়িলে জানিতে পারিবে বাঙ্গালী জাতি সে কালে যা খাইত—এখন তা চোখেও দেখিতে পায় না। সে "মহীপাল" ধান কই—যাহার সুগন্ধিতে মনে হইত বাগানে যুথিজাতি ফুটিয়াছে? সে "গোপাল-ভোগ" "সোনার ছড়া" এখন আর তেমন হয় না,—যার সরু সরু চা'ল—বাস্তবিকই দেবভোগ্য ছিল। রামেশ্বরী শিবায়ণে ইহাদের অনেক-গুলির উল্লেখ আছে।

৯। আদি-যুগে জ্যোতিষের উপর খুব নির্ভর ছিল, শুধু ডাক ও খনার বচনে নহে, অপরাপর পুস্তকেও এই জ্যোতিষের অনেক কথা আছে। জ্যোতিষের সূত্র-গুলি ছড়াতে অতি সহজ করিয়া বলা আছে, চাষারাও এক সময়ে তাহা বুঝিত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

"যে যে মাসের যে যে রাশি।
তার সপ্তমে থাকে শশী॥
সেই দিন যদি হয় পৌর্ণমাসী।
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী।" খণা।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন—এই বারটি রাশি, তোমরা শিখিয়া রাখ। ১২টি মাস এই ১২ রাশির অধীনে। মেষের হইল বৈশাখ, বৃষের জ্যৈষ্ঠ, মিথুনের আষাঢ়—এই পর্য্যায়ে কোন্ মাসের কোন্ রাশি তাহা বুঝিবে। এখন ধর, এটা আশ্বিন মাস, পূর্ব্বের ভাবে হিসাব করিয়া দেখিতে পাইবে, আশ্বিন মাসটি কন্যা রাশির। এই বৎসরের পঞ্জিকায় আশ্বিন মাসের দিনগুলি দেখিয়া যাও। কোন্ দিন চন্দ্র কোথায় থাকেন তাহা প্রত্যেক তারিখের পাশে লেখা আছে। এখন পূর্ণিমা কোন্ দিন তাহা খুঁজিয়া বাহির কর, সেই পূর্ণিমার চন্দ্র যদি কন্যা রাশি হইতে গণিয়া সপ্তম স্থানে পাও, তবে সে দিন অবশ্য চন্দ্রগ্রহণ হইবে। এত সংক্ষেপে এত বিশুদ্ধভাবে বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আর কোন দেশের পণ্ডিত চাষাকে চন্দ্র-গ্রহণ বুঝাইতে পারেন নাই।

রাজা যুদ্ধে যাওয়ার সময়, বণিক সমুদ্রে যাত্রার সময়, চাষা ক্ষেতে বীজ বুনিবার সময় জ্যোতিষের শরণ লইত। যেখানে মানুষের শক্তি কুলায় না, ফলাফল দৈবের হাতে—সেই খানেই মানুষ গণকের সাহায্য চাহিত। ঢেউ ও ঝড় সম্মুখে করিয়া সদাগর অকুল পাথারে চলিতেছে, রাজা শত্রু-সৈন্যময় বিষম রণক্ষেত্রে যাইতেছেন, চাষা বৃষ্টি রোদ-হাওয়া প্রভৃতি অনিশ্চিত শক্তি-পুঞ্জের হাতে নিজের সাধের বীজগুলি ছাড়িয়া দিতেছে। ইহা ছাড়া বিবাহাদির ফলও তো তেমনই অজানা, বর-কণের পক্ষেও তো সেও একরূপ অকুল পাথারে ঝাঁপ; এ অবস্থায় গ্রহ-নক্ষত্রের যদি কোন শক্তি থাকে, যাহাদের প্রভাবে ঝড় হয়, বৃষ্টি হয়, রৌদ্র হয়, মেঘ হয়, নদীতে বাণ ডাকে,—বিপদে তাহাদের শক্তিটা মানিয়া নেওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

আদি-যুগের সাহিত্যে অনেক জঞ্জাল আছে, কারণ তাহাতো পণ্ডিতেরা লিখেন নাই। অল্প শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিরা মুখে মুখেই ছড়া তৈরি করিত। মুখে মুখে উচ্চারিত হইয়াই তাহারা অধিকাংশ জায়গায় চলিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত লইয়া থাকি-

তেন—বাঙ্গলা ভাষা তাঁরা গ্রাহ্য করিতেন না, সুতরাং চাষার হাতে খুব ভদ্র-সাহিত্য আশা করা যায় না। কথাগুলি সবই ভাল নহে, মন্দ কথাও অনেক আছে, কিন্তু তথাপি এই সাহিত্য পড়িয়া বাঙ্গলাদেশকে যেমন মনে পড়ে এমন আর কিছুতেই নহে। এই খড়কুটো দিয়া যেন মায়েরই প্রতিমা নির্ম্মিতা হইয়াছে; সেই মাতৃমূর্ত্তির গলায় হাঁসুলী, পায়ে বাক্‌মল দেখিয়া আমাদের পাড়াগাঁয়ের ভগবতীকেই মনে পড়ে,—সেই সকল সিন্দূর কৌটা, ধানের গোলা, হাল—লাঙ্গল, বলদ এবং গৃহিণীর পরিবেশনের কথা পড়িয়া মনে পড়ে সেই ধান্যলক্ষ্মীকে,—যিনি অগ্রহায়ণে এখনও বঙ্গের কুঁড়েঘরে নবান্ন বিতরণ করেন। এই সকল কাব্যের ছন্দে মেঠো সুরের সেই সকল গান মনে পড়ে, যাহা বাঙ্গালার ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটার সময়, চাষার সানন্দ কণ্ঠ হইতে এখনও উত্থিত হইয়া আকাশ ছাইয়া ফেলে। এ সাহিত্য খাটি বাঙ্গালার সাহিত্য, দেশের নিজস্ব, বাঙ্গালীর মর্ম্ম-কথা।

দশম পরিচ্ছেদ

অনুবাদের যুগ

পাড়াগাঁয়ের ইতর সাধারণ লোকেরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, রাজাসভায় অথবা পণ্ডিত মহলে তাহার স্থান ছিল না—এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় সেকথা লেখা হইয়াছে।

পণ্ডিতেরা বড় বড় শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন—তাঁহারা পাড়াগাঁয়ের চলিত ভাষাকে বড়ই ঘৃণা করিতেন। কিন্তু ৪০০ বৎসর হইল, আমাদের ভাষা রাজসভায় একটা জায়গা দখল করিয়া লইয়াছে। এটা কি করিয়া হইতে পারিয়াছে—তাহা বলিতেছি, শোন।

হিন্দু রাজাদের অনেকেই সংস্কৃত জানিতেন। সংস্কৃত ভাষার তখন খুব প্রভাব ছিল; এই ভাষা শিখিবার রীতিটা খুবই শক্ত ছিল। প্রথম ব্যাকরণ পড়িতে হইত, এই ব্যাকরণ পড়া আরম্ভ হইত দশ বার বৎসর বয়সে এবং চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সে সেই পড়া

সাঙ্গ হইত। কিন্তু ব্যাকরণকে সেকালে শিশুর শাস্ত্র* বলিত। উহা ত শুধু জ্ঞানের মন্দিরের প্রথম ধাপে পা দেওয়া—ব্যাকরণ শিখিলে তারপর সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায় দর্শন, গণিত প্রভৃতি অপরাপর শাস্ত্র পড়িবার ক্ষমতা হইত। ইংরাজী ১৩০০ সালে মুসলমানগণ আসিয়া বাঙ্গালাদেশের অনেকটা অংশ দখল করিয়া লইল। তাহারা ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি বহুদূর দেশ হইতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালা দখল করিয়া খাটি বাঙ্গালী হইয়া পড়িল। এখন যেমন ইংরেজেরা এদেশ শাসন করেন, কিন্তু এদেশে বসবাস করেন না, যখন বুড়া হইয়া অবসর লয়েন, তখন বিলাতে চলিয়া যান,—মুসলমান শাসনকর্ত্তারা তাহা করিতেন না, তাঁহারা এইখানেই বাড়ী ঘর করিয়া এই দেশের ভাষা শিখিয়া দস্তুরমত বাঙ্গালী হইয়া পড়িতেন।

মুসলমান নবাব ও বাদসাহেরা দেখিতেন, তাঁহাদের রাজধানীর শত শত হিন্দু-প্রজারা শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া ধূপ ধূনো অগুরু জ্বালাইয়া সকালে সন্ধ্যায় তাঁদের মন্দিরে আরতি করিতেছেন,—রামায়ণ, মহাভারত

* চৈতন্য ভাগবত—আদিকাণ্ড।

প্রভৃতি শাস্ত্র-কথা লইয়া তাঁহারা নানারূপ উৎসবে মত্ত হইতেছেন, অথচ এ সকল কি মুসলমানগণ তাহা বুঝিতেন না। যাঁহারা প্রজা—যাঁহাদের মধ্যে চিরকালের জন্য মুসলমানেরা থাকিবেন, তাঁদের সম্বন্ধে সমস্ত কথা জানিবার জন্য তাঁহাদের একটা আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। বাদসাহগণ হিন্দু-পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"তোমাদের শাস্ত্রটা কি আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও।"

পণ্ডিতেরা সংস্কৃত পুথি লইয়া প্রথম ব্যাকরণের পড়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন।

বাদসাহেরা নানা কাজে ব্যস্ত—বিশেষ হিন্দুর ধর্ম্ম তাহাদের ধর্ম্ম নয়, তাঁরা কেন সেই সকল ব্যাকরণের কচকচি শিখিতে জীবনের দশ বৎসর অপব্যয় করিবেন। তাঁহারা এদেশে থাকিয়া এদেশের চলিত কথা শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন,—"এদেশের ভাষায় ঐ তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে, তাহা আমাদিগকে শোনাও।"

বাদসাহের আদেশ, কি করা যায়? পণ্ডিতেরা যদিও দেশীভাষাকে ঘৃণা করিতেন, তথাপি বাঙ্গালা ভাষায়

তাঁদের শাস্ত্রের অনুবাদ করিতে হইল। আমরা প্রথমতঃ নসিরখানের একখানি বাঙ্গালা মহাভারতের অনুবাদের কথা পাইতেছি, তারপর হুসেন সাহের সেনাপতি চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা পরাগল খাঁর আদেশে রচিত আর একখানা মহাভারতের অনুবাদ পাইয়াছি। এই বাঙ্গালা মহাভারতখানি রচনা করিয়াছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। এই পুস্তকখানি অনেকে "পরাগলী মহাভারত" বলিয়া জানেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকরণ নন্দী জৈমিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করেন। গৌড়াধিপ সামসুদ্দিন ইউসফ সাহেবের আদেশে ইংরাজী ১৪৭৫ সালে অর্থাৎ চৈতন্যের জন্মিবার এগার বৎসর পূর্ব্বে, মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ প্রণয়ন করেন, এই অনুবাদ করার জন্য বাদসাহ মালধর বসুকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি দিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস রামায়ণ বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন, তিনিও কোন রাজা বা বাদসাহের আদেশে এই কাজের ভার লইয়াছিলেন। এখন মনে হয় রাজা গণেশের আদেশেই তিনি এই কাজে হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই রাজা গণেশ না হইয়া কোন মুসলমান বাদসাহও

হইতে পারেন। এখন পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন নিশ্চিত রূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

মুসলমান সম্রাটেরাই তখন গৌড় বাঙ্গালার প্রভু। সুতরাং তাঁহারা যখন বাঙ্গালা ভাষার আদর করিলেন, তখন হিন্দু-পণ্ডিতগণের আড়চক্ষের ঘৃণা সহিয়াও আমাদের পাড়াগাঁয়ের ভাষা—সঙ্কুচিত চরণে ভয়ে ভয়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সম্মানলাভ করিলেন। হিন্দু-কবিগণ মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের নিকট অনেক-স্থানে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। "প্রভু গয়েসুদ্দিন সুলতান" বলিয়া বিদ্যাপতি গৌড়ের বাদসাহের নিকট মাথা হেঁট করিয়াছেন—"সে যে নসিরা-সাহ জানে, যারে হানিল মদন-বানে, চিরঞ্জীবী রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভানে।" এই কথা পড়িয়া মনে হয়, সম্রাট নসিরাসাহও কবি বিদ্যাপতিকে আদর করিয়াছিলেন। মালাধর বসুও গৌড়ের বাদসাহাদের স্তব স্তুতি করিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত হুসেন সাহের এবং মাধবাচার্য্য আকবরের প্রশংসা করিয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

মুসলমান বাদ্‌সাহদের দেখাদেখি হিন্দু-রাজারাও

বঙ্গ-ভাষার উপর প্রসন্ন হইলেন ; মুকুন্দরামকে আশ্রয় দিয়াছিলেন মেদিনীপুরের আরড়া ব্রাহ্মণ ভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ঘনরাম বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রসাদ-লাভ করিয়া ধর্ম্ম-মঙ্গল লিখিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নদা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কিন্তু যদিও অধিকাংশ স্থলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাই সংস্কৃত পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের অনেকেই বাঙ্গালা ভাষাকে খুব বিদ্বেষ করিতেন। একটা শ্লোকে দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণেরা লিখিয়াছেন—

"যাহারা ১৮ পুরাণ ও রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা গোষ্ঠি শুদ্ধ রৌরব নামক নরকে যাইবেন।"

আর একটা বামুনে ছড়ায় লিখিত আছে—

"রামায়ণ লেখক কৃত্তিবাস ও মহাভারত লেখক কাশীদাস এবং যাঁহারা বামুনের সঙ্গে সমভাবে ঘেঁষিয়া চলেন—এই তিন বড়ই সর্ব্বনেশে লোক।"

লং সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় লেখা আছে, যে মহাভারত বাঙ্গালায় লেখার জন্য কাশীদাসকে ব্রাহ্মণেরা অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, তিনি নির্ব্বংশ হইবেন।

কিন্তু এই সকল বাধা বিঘ্ন সত্বেও বাঙ্গালা ভাষার জয় হইল। অবশেষে মস্ত বড় বড় পণ্ডিতেরাই এই ভাষার বই লিখিতে স্নুরু করিয়া দিলেন। সংস্কৃতের প্রকাণ্ড ভাণ্ডার হাতের কাছে পাইয়া বাঙ্গালী কবিরা প্রায় সমস্ত পুরাণ ও শাস্ত্রগুলি অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন—রামায়ণ মহাভারত হইতে স্নুরু করিয়া ভাগবত কাশীখণ্ড পর্য্যন্ত তাহারা কিছুই বাদ রাখেন নাই।

বাঙ্গালা ভাষা এই সময় হইতে অর্থাৎ প্রায় ছয়শত বৎসর যাবৎ সংস্কৃত শব্দের দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতেছে। এই ভাষা প্রাকৃত-ভাষা হইতে আসিয়াছে এবং পূর্ব্বে ইহার নামও ছিল "প্রাকৃত-ভাষা" কিন্তু এই সংস্কৃত অনুবাদের দরুণ ইহাতে এখন এত সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে যে, কেহ কেহ ভ্রম করিয়াছেন যে ইহা সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

এই অনুবাদ-সাহিত্যে সংস্কৃত উপমা ও সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি হইয়াছে। তারপর ভাষাটা এমন এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল যে ইহা ঠিক সংস্কৃতের মত হইয়া উঠিল। এ বিষয়ে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র রায় সর্ব্বাপেক্ষা সফল হইয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যে এমন অনেক পদ আছে, যাহা দেবনাগর হরপে লিখিলে তাহা অবিকল সংস্কৃত কবিতা হইয়া যাইতে পারে, একটা উদাহরণ দিতেছি—

জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্ক শেখর দিগম্বর,
জয় শ্মশান নাটক, বিষাণ-বাদক
হুতাশ ভালক মহত্তর।
জয় ত্রিলোক কারক, ত্রিলোক পালক
ত্রিলোক নাশক মহেশ্বর॥

ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। এই কৃষ্ণচন্দ্র রাজাই ইংরেজদিগকে সাহায্য করিয়া যে ষড়যন্ত্র করেন, তাহার ফলে পলাসীর যুদ্ধে ক্লাইবের জয় হয়, এবং বঙ্গদেশ নামে মাত্র মিরজাফরকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রকৃত-পক্ষে ইংরেজদের

অধীন হয়। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল ছাড়া রসমঞ্জরী ও চণ্ডী-নাটক নামে আর দুইখানি কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্র ইং ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৬০ খৃঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। সংস্কৃতের প্রভাব ইঁহার রচনার মধ্যে কতটা পড়িয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত কবিতাটি পড়িলে বোঝা যাইবে।

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্নগাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥"

এই কবিতায় অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ আছে,—কিন্তু আবার অনেকগুলি এমন শব্দও আছে যাহা সংস্কৃতও নহে বাঙ্গলাও নহে—সেগুলি "ধ্বন্যাত্মক" শব্দ, যেমন 'ফণা ফণাফণ' ইত্যাদি, শিঙ্গাতে যেরূপ আওয়াজ হয় তাহারই ধ্বনি নকল করিয়া "ভভম্ভম" শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতচন্দ্র এইরূপ "ধ্বন্যাত্মক" শব্দ অনেক ব্যবহার করিয়াছেন। এই কবিতার উপর সংস্কৃতের

প্রভাবের প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা ভূজঙ্গ প্রয়াত নামক একটি সংস্কৃতের ছন্দে লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ বড় সংস্কৃতের ছন্দ আর কোন কবি এরূপ নির্ভুল ও সুন্দর ভাবে আনিতে পারেন নাই। অথচ এই বড় ছন্দ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করিয়া ভারতচন্দ্র কবিত্ব ভুলিয়া যান নাই। "ছলচ্ছল কলকল টলটল তরঙ্গা" ছত্রে কবি "ছলচ্ছল" কথাটা দ্বারা নদীর চঞ্চল প্রবাহ, "কলকল" দ্বারা নদীর মধুর শব্দ এবং "টলটল" দ্বারা নদীর জলের নির্ম্মলতা বুঝাইয়াছেন। এরূপ অল্প কথায় এমন সুন্দর ভাবে নদীর তিনটা বিশেষ গুণ বুঝাইতে পারা সামান্য শক্তির কথা নহে।

এই সংস্কৃতের প্রভাব ভারতচন্দ্রের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে আলোয়াল নামক এক মুসলমান কবি বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছিলেন। ইঁহার বাড়ী ছিল চাটগাঁয়ে, ইঁহার পিতা পর্ত্তুগিজ ডাকাতদের হাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। কবি ব্রহ্মদেশের রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে পদ্মাবৎ কাব্য রচনা করেন। তখন মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন। মালীক মহাম্মদ নামক একজন হিন্দুস্থানী

কবি হিন্দীভাষায় চিতোর-রাণী পদ্মাবতীর উপাখ্যান রচনা করেন, আলোয়াল সেই কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলেন,—কিন্তু আলোয়াল নিজে সংস্কৃতের অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, অনুবাদ করিতে যাইয়া অনেক বাহাদুরী দেখাইয়াছেন, একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমালদ্রুম,
মুকুলিত চূতলতা কোরক জালে।
যুবজন হৃদয় আনন্দে পরিপূরিত,
রঙ্গমল্লিকা মালতী মালে॥

ভারতচন্দ্রের সমকালে পূর্ব্ববঙ্গে তিনজন কবি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা ঢাকার প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের জ্ঞাতি। রামগতি সেন ও জয়নারায়ণ সেন—সহোদর ভ্রাতা,—এবং আনন্দময়ী ইঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী। আনন্দময়ী জয়নারায়ণের সঙ্গে মিলিয়া হরিলীলা নামক একখানি সুন্দর কাব্য রচনা করেন। জয়নারায়ণ আর একখানি কাব্য রচনা করেন, তাহার নাম চণ্ডীমঙ্গল। রামগতি সেন "মায়া তিমির চন্দ্রিকা" কাব্য রচনা করেন।

পূর্ব্বে যে সকল কবির বিবরণ দেওয়া গেল, তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বাঙ্গলা ভাষাকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সকলের অপেক্ষা বেশী সফল হইয়াছিলেন ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্র যেরূপ বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কবিবর রামপ্রসাদ সেনও একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। তিনিও অনেক সংস্কৃত শব্দের আমদানী করিয়া কাব্যখানি সাজাইয়া বাহির করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহার রচনায় বাঙ্গালার সঙ্গে সংস্কৃতের খাপ খায় নাই। ভারতের কবিতায় বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের হরগৌরী মিলন হইয়াছিল, এমনটি বাঙ্গালী আর কোন কবি করিতে পারেন নাই, সংস্কৃতের বৃথা পাণ্ডিত্য না দেখাইতে যাইয়া যেখানে রামপ্রসাদ সরল বাঙ্গালায় প্রাণের কথা গানের ছন্দে লিখিয়াছেন, সেখানে তাহার কবিত্ব অতি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। মাঠে মাঠে হালকাঁধে করিয়া চাষারা সেই গান গাহিয়াছে, পুকুরঘাটে বউএরা বাসন মাজিতে বসিয়া হাতের চুড়ীর ঠুন ঠুন শব্দের দ্বারা যেন মন্দিরা বাজাইয়া মৃদুকণ্ঠে এই সকল গান গাহিয়াছে, সাধু, জ্ঞানী, পণ্ডিত, কালীর মন্দিরের আঙ্গিনায়

বসিয়া রামপ্রসাদী গান গাহিয়াছে—এই সকল গান প্রায়ই মালশ্রীরাগিণীতে গীত হইয়া থাকে। চলিত কথায় "মালশ্রী"কে "মালসী" বলে। এই মালসী গান এক সময়ে বাঙ্গলার সদর, অন্দর, উৎসবের আসর এক সঙ্গে দখল করিয়া বসিয়াছিল।

> "মনরে কৃষি কাজ জাননা।
> এমন মানব জীবন রৈল পতিত,
> আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোনা।"

প্রভৃতি গান এক সময়ে সর্ব্বত্র শোনা যাইত। এখনও পল্লীগ্রামে ক্ষেতে হাল চালাইয়া শ্রান্তভাবে চাষা কখনও কখনও গাইয়া থাকে—

> "এবার আশার আশা ভবে আশা
> আসা মাত্র সার হইল।
> যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ি ভ্রমর ভুলে রইল।
> মা নিম খাওয়ালি চিনি ব'লে কথার করি ছলো।
> ওমা, মিঠার লোভে তিতমুখে সারা দিনটা গেলো।

মা খেলবি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালি ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলিলি মাগো আশা না পুরিলো।
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলা যা হবার তাই হ'লো।
এখন সন্ধ্যা হলো, কোলের ছেলে মা
কোলে নিয়ে চল।"

রামপ্রসাদ সেনের বাড়ী ছিল হালিসহর। ইনিও কৃষ্ণ-চন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন।

ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল অনেক পণ্ডিতের সাহায্যে কাশীখণ্ডের একখানি অনুবাদ করেন, এই অনুবাদ ১৮০৪ সনে সম্পূর্ণ হয়।

কিন্তু প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে রসময় এবং তার কিছু পরে গিরিধর গীতগোবিন্দের যে বাঙ্গালা অনুবাদ করেন—তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। গিরিধরের গীতগোবিন্দের একটি স্থান তুলিয়া দেখাইতেছি।

"তুয়া নিজ নাম করি সঙ্কেত বাজায় মুরলী মৃদুভাষে
তুয়া তনু পরশি ধূলি তনু উড়ত তারে পুনঃ পুনঃ
প্রশংসে।

উড়াইতে পক্ষী, বৃক্ষদল বিচলিতে, তুয়া
আগমন হেন মানে।
দ্রুতগতি শেষ করত পুন চমকই নিরখন্ত
তুয়া পথ পানে।
শবদ অধীর নূপুর দূরে তেজ, রিপু সদৃশ রতিরঙ্গে
অতি তমঃ পুঞ্জ কুঞ্জবনে চল সখি
নীল উড়নী লেহ সঙ্গে।

যাঁহারা সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় খুব বেশী পরিমাণে আনিয়াছেন, তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা এই পথের প্রথম পথিক, যাঁহারা লোকের রুচি প্রথমতঃ শাস্ত্রগ্রন্থের দিকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিদের কথা একেবারেই বলা হয় নাই।

সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডারের দিকে প্রথম পথ দেখাইয়াছেন বৈষ্ণব কাব্য চণ্ডীদাস। তিনি প্রায় ৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত উপমা বাঙ্গলা ভাষায় আনেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি সংস্কৃতের ভাণ্ডারের পথ

টের পাইয়া—এবং প্রথম প্রথম কতকটা সেই পথে ঢুকিয়াও আবার পাড়া-গাঁয়ের ভাষার পথে ফিরিয়া আসিয়া ছিলেন, সে কথা পরে বলিব। চণ্ডীদাসের বাড়ী ছিল বীরভূম জেলায়, নান্নুরগ্রাম।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন নামে একখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় এই পুস্তক প্রথম প্রকাশ করেন।

এই কাব্যে চণ্ডীদাস অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন, ইহার প্রথম অংশ জয়দেবের গীত-গোবিন্দের একরূপ অনুবাদও বলা যাইতে পারে।

বোধ হয় প্রায় চণ্ডীদাসের সমকালে সঞ্জয় নামক কোন কবি মহাভারতের একখানি বাঙ্গলা অনুবাদ রচনা করেন। তারপরে কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরণ-নন্দী, নিত্যানন্দ ঘোষ প্রভৃতি বহু কবি মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন—ইহারাই সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে দু'হাতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সজ্জিত করেন।

তিন শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল কবির রচনার অনেক উন্নতি করিয়া, নিজের অপূর্ব্ব কবিত্ব ও

ভক্তি দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া কায়স্থ কবি কাশীদাস মহা-ভারতের আর একখানি অনুবাদ রচনা করেন। তিনি সংস্কৃত শব্দ ও উপমার অজস্র ব্যবহার করেন। তাঁহার মহাভারত বড়ই সুন্দর। এই তিনশত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালার পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা এই মহাভারত পড়িয়া পড়িয়া প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। কাশীদাসের রচনার একটা নমুনা দেখাইতেছি :—

কৃষ্ণ ও শিবের একঙ্গ হইয়া যাওয়া

"আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক।
অর্দ্ধ শশি-শুক্ল, শ্যাম হইলা অর্দ্ধেক॥
অর্দ্ধ জটাজুট অর্দ্ধ কেশ মনোহর।
অর্দ্ধ কিরীট, অর্দ্ধ ফণীর লহর॥
কৌস্তুভ তিলক অর্দ্ধ, অর্দ্ধ শশিকলা।
অর্দ্ধ গলে হাড়মালা, অর্দ্ধ বনমালা॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে, কুণ্ডলী কুণ্ডল।
শ্রীবৎস লাঞ্জন অর্দ্ধ শোভিত গরল॥
অর্দ্ধ মলয়জ, অর্দ্ধ ভস্ম কলেবর।
অর্দ্ধ বাঘাম্বর, অর্দ্ধ কটি পীতাম্বর॥

এক পদে ফণী, একে কনক নূপুর।
শঙ্খচক্র করে শোভে, ত্রিশূল, ডম্বুর ॥
একভিতে লক্ষ্মী, একভিতে দুর্গা সাজে।
কাশীদাস কহে দুহাঁর চরণ সরোজে ॥"

কিন্তু বাজারে যে সকল মহাভারত "কাশীদাসী" মহাভারত বলিয়া পরিচিত, তাহার সমস্তটা কাশীদাসের রচনা নহে। আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্বের কতকদূর লিখিয়া কাশীদাস প্রাণত্যাগ করেন, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস আর বাকী খানি রচনা করেন। নন্দরামদাসের রচনার আবার প্রায় পোনের আনাই চুরি, পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতের লেখক নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নামের ভনিতা দিয়া নন্দরাম দাস তাহার খুড়া কাশীদাসের মহাভারতের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন। এখন আবার বটতলার ছাপা পুস্তকে নন্দরামের ভণিতা বাদ পড়িয়াছে এবং সমস্ত মহাভারতখানিই কাশীদাসের নামে চলিয়া আসিয়াছে। কাশীদাস বর্দ্ধমান জেলায় সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মেদিনীপুরে এক পাঠশালায় পণ্ডিত ছিলেন।

তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা ছিলেন, একজনের নাম গদাধর ও অপরের উপাধি কৃষ্ণকিঙ্কর, ইঁহারাও বেশ সুকবি ছিলেন।

রামায়ণ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন কৃত্তিবাস। এই অনুবাদ রচিত হইয়াছিল পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে। কৃত্তিবাসের বাড়ী ছিল নদীয়া জেলায়, ফুলিয়া গ্রামে। ইনি মুখুয্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন। অল্প-বয়সে সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া কৃত্তিবাস গৌড়ের রাজ-দরবারে উপস্থিত হন, সম্ভবতঃ রাজা গণেশ তখন গৌড়ের সম্রাট ছিলেন। গৌড়ের রাজা গণেশ কৃত্তিবাসকে বাঙ্গালার রামায়ণ লিখিতে আদেশ করেন।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কৃত্তিবাস অতি সবল ও সুন্দর ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাসের ঠাকুর-দাদার নাম ছিল মুরারি, ইনিও সংস্কৃতে একজন মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন। মুরারির পুত্র ছিলেন বনমালী, এই বনমালীই আমাদের কৃত্তিবাসের পিতা। কৃত্তি-বাসের মায়ের নাম ছিল,—মালিনী। কৃত্তিবাস নানা রোগে ভুগিয়া যৌবনের শেষেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ এই পাঁচশত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে, তোমাদের সকলের ঘরেই এই বই আছে। কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ এই দুইখানি পুস্তক আগে বাঙ্গালার সকলে পড়িত। সীতা-সাবিত্রী, রাম, ভীষ্ম, কৃষ্ণ-অর্জ্জুন প্রভৃতির কথা এই পুস্তকে আছে। সেই সকল মহা-পুরুষ ও সতীরা সত্যের জন্য, প্রেমের জন্য কিরূপ অদ্ভুত ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন, তাহার কথা এই পুস্তক দুইখানিতে বিশেষভাবে আছে। এই পুস্তক দুইখানি পড়িয়া, বাঙ্গালীর মেয়েরা কপালে সিন্দুর, হাতে লোহা ও শাঁখা পরিয়া দরিদ্র হইলেও তখন যেরূপ গৌরব অনুভব করিতেন, এখনকার দিনে সেরূপ গৌরব কিছুতেই অনুভব করিতে পারেন না। এই দুই-খানি পুস্তকে স্নেহ, ভক্তি, ধর্ম্ম প্রভৃতি মহৎগুণকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে, কর্ত্তব্য করার জন্য সমস্ত কষ্ট অবলীলাক্রমে স্বীকার করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য হিন্দুর ঘরে মিটমিট করিয়া মাটির দীপে যে সলিতা জ্বলিত, তাহাতে হিন্দু-লক্ষ্মীদের কপালে সিন্দুর উজ্জ্বল হইয়া উঠিত এবং পায়ের আল্‌তার রঙ্গে লক্ষ্মীর

পাদপদ্মের প্রভা দেখাইত। এই পুস্তক দুইখানিতে বাঙ্গালার কুঁড়ে-ঘরে, উনুনের পাশে, ঢেঁকিশালায়, গোয়াল ঘরে লক্ষ্মীদেবীর পায়ের ছাপ দেখাইয়া দিয়াছিল। ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার ন্যায় ইহাদের প্রভাবে হিন্দুর মেয়েরা দরিদ্র কুঁড়ে-ঘরে অমূল্য গুণরাশি বহন করিত। রামায়ণ ও মহাভারত বাঙ্গালায় এক উচ্চভাবের রাজধানীর সৃষ্টি করিয়াছিল, বাঙ্গালার নর-নারী এই রাজধানীর প্রজা হইয়াছিল। কাশীদাস ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে এবং কৃত্তিবাস ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এই দুইজন কবি বাঙ্গালী-জীবন-গঠন করিতে যতটা সাহায্য করিয়াছেন, এতটা আর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

নিম্নে কৃত্তিবাসের কবিতার খানিকটা তুলিয়া দেওয়া হইল——

বালির মৃত্যুকালে উক্তি।

"ভূমে পড়ি বালি রাজা করে ছট্‌ফট্‌।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালির পাশে॥

রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড়মড় করে দেয় গালাগালি॥
নিষেধিলা তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান।
আমারে মারিলা রাম এ কোন বিধান॥
সজারু, গণ্ডার, কূর্ম্ম, গোধিকা, শল্লকী।
ভক্ষনীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চনখী॥
তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর।
আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির॥
আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন।
মৃগ নহি শাখা মৃগে কোন্ প্রয়োজন॥
নির্দ্দোষ বানর আমি মরি কোন্ কার্য্যে।
এই হেতু অধিকার না পাইলা রাজ্যে॥
কোন্ দেশ লুটাইয়া দিলাম কারে ক্লেশ।
কোন দোষে করিলা আমার আয়ুঃ শেষ॥
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সকলে প্রশংসে॥

এ কোন ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলা না জানি।
অপরাধ বিনা বিনাশিলে মম প্রাণী॥
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস।
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ॥"

পূর্ব্বের পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইল, তদ্দারা এই জানা গেল যে ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের লেখার সংস্কৃতের প্রভাব প্রথম দৃষ্ট হয়। ইহার পূর্ব্বেই রাজা বল্লাল সেন হিন্দুধর্ম্মের একটা নূতন গড়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে জাতিভেদের খুব আটা আঁটি নিয়ম হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা খুব বড় সম্মান লাভ করিয়া "ভূদেব" অর্থাৎ পৃথিবীতে দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশের ত্রিসীমা হইতে তাড়িত হইয়াছিল।

চণ্ডীদাসের পর কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, মালাধর বসু প্রভৃতি কবিগণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দের আমদানী করিয়া বঙ্গ-ভাষার চেহারাটা একবারে বদলাইয়া দিয়াছিলেন। এই সংস্কৃত-প্রধান-যুগে কবি আলোয়াল এখন হইতে ২৫০ বছর পূর্ব্বে

পদ্মাবৎ নামক যে কাব্য রচনা করেন, তাহা সংস্কৃতের মতই কঠিন। সে ভাষা যে সে বুঝিতে পারিবেন না। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দ ও সংস্কৃত শব্দ গড়িয়া পিটিয়া তাহা দিয়া বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী গহনা তৈরী করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষা এখন আর পাড়াগেঁয়ে সাদাসিধা সাড়ী ও বাউটি পরা নোলক নাকে মল পায়ে মেয়ে নহে। ভারতচন্দ্রের যুগে বঙ্গভাষা বিচিত্র অলঙ্কার পরা, হার কেউর মুকুট পরা রাজরাজেশ্বরী।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আদিযুগের সমাজ

আদিযুগে বণিক জাতি প্রবল ছিলেন। তাঁহারা ধনে-মানে বড় ছিলেন,—সদাগরের পুত্র রাজপুত্রের বন্ধু ছিলেন,—সদাগরের পুত্র রাজকন্যাকে বিবাহ করিতেন, —তাঁহারাই কাব্যের নায়ক হইতেন। ধনপতি, শ্রীমন্ত, চাঁদসদাগর, লাউসেন, গোবিচন্দ্র প্রভৃতি ইহারা বৈশ্য বা বেণিয়ার জাত ছিলেন। বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের মেয়ে বিবাহ করিতে পারিত, শ্রীমন্ত সদাগর বিক্রমশীল ও শালীবাহন নামক এই দুইজন ক্ষত্রিয় রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের টোলে বেনের ছেলে পড়িতে পাইত, শ্রীমন্ত দানাই ওঝার টোলে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ দিনরাত পৈতা কাঁধে ঝুলাইয়া রাখিতেন না,এ সকল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কিন্তু ক্রমশঃ বেণেরা মিথ্যাবাদি ও কপট হইতে লাগিলেন, তাহারা নানা ছল, কৌশল ও মিথ্যাচারণ

দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। মিথ্যাচারী হইলে যেমন ব্যক্তি-বিশেষের—তেমনই জাতি-বিশেষেরও অধঃপতন হইয়া থাকে। তোমরা মুরারি শীলের কথা পড়িয়াছ, সে কেমন দুষ্ট তাহার পরিচয় পাইয়াছ। গীতি-কথায়ও বেনেদের কপটতা ও মিথ্যাচারের প্রমাণ আছে—কাঞ্চনমালার গল্পে পাওয়া যায়—

"কোনহ বেনে দারচিনি দিতে
দরমুজ বাহির করে।
কোনহ বেনে কাহনের বস্তু
বেচে সিকার দরে॥
কোনহ বেনে খাণ্ডারা পাথর
ঝাঁপিতে ভরিয়া থোয়।
(ওরে) মহামাণিক্য সাহামাণিক্য কয়ে
লোকেরে বিকোয়॥"

নৈতিক পতনের সঙ্গে সঙ্গে বণিক-জাতির সামাজিক পতনের সুরু হয়। অর্থ লোভে যাহারা ঐ সকল কার্য্য করিতে পারিত, তাহাদের অনেকের হাতের জল সমাজে বন্ধ হইয়া গেল।

এদিকে ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মের জন্য—ভক্তির জন্য যে সকল ত্যাগ স্বীকার দেখাইলেন, তাহাতে সমাজ তাঁহাদিগকে মাথায় করিয়া লইল। কৃত্তিবাসের অসামান্য পাণ্ডিত্য-দর্শনে যখন গৌড়েশ্বর তাঁহাকে বহু অর্থ দিতে চাহিলেন, তখন ব্রাহ্মণতেজ সম্পন্ন তরুণ যুবক মাথা উঠাইয়া গৌরবে রাজা গণেশকে শুনাইয়া দিয়াছিলেন —

"কারু কিছু নাহি লই গৌরবমাত্র সার।"

পঞ্চ গৌড়াধিপতি মহামহিমান্বিত বঙ্গাধিপের মুখের উপর যিনি তাঁহার দান লইবেন না, একথা বলিতে পারেন—তাঁহার বুকের পাটা কত বড়! এখন কয়জন ব্রাহ্মণ এইরূপ গর্ব্ব করিতে পারেন? তখন বঙ্গদেশের অলি-গলিতে এইরূপ তেজস্বী ব্রাহ্মণ অনেক ছিলেন। এইজন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণগণের পায়ে রাজরাজেশ্বরগণ মাথা নোওয়াইয়া প্রণাম করিয়াছেন। মুসলমান সম্রাট রাজ্য-শাসন ও কর আদায় করিতেন। কিন্তু সমাজ ব্রাহ্মণকেই তাহাদের প্রকৃত রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এইজন্য রাজবাড়ীর মণি-মুক্তাময় চূড়ার দিকে তাঁহারা ফিরিয়া চাইতেন না; ব্রাহ্মণের

তালপাতা-ছাওয়া কুঁড়ে ঘরকে তাঁহারা খুব বড় বলিয়া মনে করিতেন।

এই ব্রাহ্মণ-প্রধান যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের জয়জয়কার। কাশীদাস লিখিয়াছেন—ব্রাহ্মণের ক্রোধে চন্দ্রে কলঙ্ক হইয়াছে, সমুদ্র লবণাক্ত হইয়াছে, স্বয়ং ভগবান ব্রাহ্মণের লাথি বুকে ধারণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের ক্রোধে সগর রাজা নির্ব্বংশ হইয়াছে। এই সকল আজগুবি কথার সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণকে বাড়ানো হইয়াছে।

পৃথিবীতে যে কোনরূপে কেহ সৌভাগ্যশালী হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের ফল; এবং যে কেহ কোনরূপ কষ্ট পাইয়াছে—তাহা সকলই ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফল;—বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, এই কথাটিই খুব জোরে ডঙ্কা-নাদে ঘোষিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি-যুগে এইরূপ একটী কথাও নাই। ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে নানারূপ শুভফল পাওয়া যায়, স্বর্গ তো দাতার হাতে আপনি ধরা পড়ে,—এই কথা ব্রাহ্মণ্য-প্রধান এই সাহিত্যের পত্রে পত্রে।

আদিযুগের সাহিত্যে ব্রাহ্মণ বা দেবতার কোন প্রভাব নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গুরু এবং সিদ্ধ-পুরুষেরই সেই সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পদ। দেব-তারা তথায় অক্ষম। সিদ্ধ গুরুর চোটে দেবতারা অস্থির। হাড়িসিদ্ধা ইন্দ্রের পুত্র মেঘনালকে দিয়া নিজ মাথায় ছত্র ধরাইয়াছেন, চন্দ্র-সূর্য্য দুইটাকে ধরিয়া আনিয়া দুই কর্ণের কুণ্ডল করিয়া পরিয়াছেন; ভগবানের অবতার কূর্ম্মের পৃষ্ঠে রন্ধন করিয়াছেন। ময়নামতী যমকে তাড়া করিয়া যে সকল শাস্তি দিয়াছেন, তাহা ময়নামতীর গানে খুব বিশেষরূপে বর্ণিত হই-য়াছে। গোরক্ষনাথ যোগী স্বয়ং ভগবতীকে লাঞ্ছনার শেষ করিয়াছেন, লাউসেন সূর্য্যকে পশ্চিম হইতে উদয় করাইয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রধান যুগে দেখিতে পাই, লোকেরা দেবতাদিগকে ভক্তি স্তুতি করিতেছে। কিন্তু আদিযুগে দেবতারাই মানুষকে ভয় করিতেছেন,—মানুষ দেবতাদিগের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতেছে। সাহিত্যের এই অধ্যায়টি ভাল করিয়া পড়িলে তোমরা বুঝিবে কেন চণ্ডীদাস সেইযুগে লিখিয়াছিলেন—

"শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ বড়
তাহার উপরে নাই।"

আদিযুগে মানুষ স্বীয় চরিত্রের বলে দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞানের চূড়ান্ত অর্থাৎ 'মহাজ্ঞান' লাভ করিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকে না, এই ছিল ধারণা। ইন্দ্রিয়-সংযম ও তপস্যা করিয়া "মহাজ্ঞান" পাইতে হইত। মহাজ্ঞান লাভ করিলে দেবতারা মানুষের গোলাম হইয়া যাইতেন। বৌদ্ধরা ঈশ্বর মানিতেন না, দেবতাদিগকে জ্ঞানীর অপেক্ষা ছোট কল্পনা করিতেন, এই জন্য শেষে তাঁহারা নাস্তিক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। আদিযুগের সাহিত্যে সর্ব্বত্র ইন্দ্রিয় দমন দেখা যায়। গোরক্ষ যোগী, লাউসেন, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্ত্রীলোকের রূপ-মোহে পড়েন নাই। তাঁহাদিগকে কত রূপসীরা প্রলোভন দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বিচলিত হন নাই। কর্ম্মই ছিল তাহাদের ব্রহ্মাস্ত্র, এই কর্ম্ম দ্বারাই তাঁহারা বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন। আদিযুগের সাহিত্যে বড় বড় অক্ষরে কর্ম্মের ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের কথা লিখিত আছে।

কিন্তু পরবর্ত্তী সাহিত্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম কোথায় ভাসিয়া গেল, ভক্তি ও নিষ্ঠা তাহাদের স্থান লইল—নাম জপ করিলে সর্ব্ব পাপের মোচন হয়—উপবাস করিলে স্বর্গলাভ হয়—এই সূত্র প্রাধান্য লাভ করিল। কৃত্তিবাস গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার একভাই মাসে ছয়টি করিয়া উপবাস করেন। একাদশীর উপবাসের ফল-কীর্ত্তন নানা পুস্তকে পাওয়া যায়। কাশীদাস লিখিয়াছেন—একবার মাত্র হরির নাম করিলে যত পাপ নষ্ট হয়,মানুষ এক জীবনে তত পাপ করিতে পারে না। একবার গঙ্গাস্নান, একবার হরিনাম করিলে যদি জীবনের সমস্ত পাপ দূর হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম করিয়া আর কি লাভ! সুতরাং ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে হিন্দুর কর্ম্ম-জীবন লুপ্ত হইল—এই সময়ের সাহিত্যে কেবল তপ-জপের কথা, কর্ম্ম-গৌরবের কথা আর তেমন পাওয়া যায় না। আদিযুগের সাহিত্যে চাঁদ সদাগরের মত তেজস্বী পুরুষ, কালুডোম ও লখাই ডুমনীর মত রাজ-ভক্ত কর্ম্মী, হরিহর বাইতির মত সত্যবাদী নির্ভীক চরিত্র পাওয়া যায়—কিন্তু এই উপাখ্যানগুলিকে পাছে ফেলিয়া ধ্রুব, প্রহ্লাদ ভক্তি ও হরিনামের

শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া আমাদের সমাজের আদর্শ হইলেন।

কর্ম্ম বড় কিংবা ভক্তি বড়, তাহা আমি জানি না। সাহিত্য মনুষ্য-সমাজের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। মানুষের মন একদিকে যাইয়া ঘড়ির দোলন-দণ্ডের মত আবার ঠিক উল্টাদিকে ছুটিয়া যায়,—আদিযুগের সাহিত্য জ্ঞান ও কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত, ব্রাহ্মণ্য-প্রধান যুগে জ্ঞান ও কর্ম্ম ছাড়িয়া মানুষেয় শুষ্কমন ভক্তি ও প্রেমের তত্ত্ব আলোচনা করিতেছিল।

আদিযুগে গৌড় ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রাজধানী ছিল,—সমস্ত ভারতবর্ষ গৌড়ের আমোদ-প্রমোদ ও সাহিত্যের সাড়া দিয়া উঠিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ যেরূপ ভারতের সর্ব্বত্র গীত হইত, সেইরূপ বাঙ্গলার গোপীচন্দ্রের গান ও মনসাদেবীর ভাসান ভারতবর্ষের বহুস্থানে গীত হইত। এখনও পুণায় বঙ্গের রাজা গোবিন্দ্রচন্দ্রের গল্প লইয়া নাটক অভিনীত হয়, কাব্য রচিত হয় এবং উক্ত রাজার ছবি বাজারে বিক্রীত হয়। মনসাদেবীর ভাসান-গান, বঙ্গের চাঁদ-সদাগর ও লখীন্দরের কথা

লইয়া ভাগলপুর এমন কি পাঞ্জাবেও কাব্য রচিত হয়।

শুধু ভারতবর্ষ নহে, বঙ্গদেশের নানা গল্প-কথা আমরা ইয়ুরোপে পর্য্যন্ত পাইতেছি। ময়নামতী বাজ হইয়া যমরাজকে তাড়া করিয়াছিলেন, পাণীকাউর হইয়া চিংড়ীমাছরূপী গোদা যমকে জলের নীচে অনুসরণ করিয়াছিলেন—ঠিক এই রকমের কথা গ্যালিক উপাখ্যানে আছে। বাঙ্গালা রামায়ণের ভস্মলোচনের কথা গ্যালিক উপাখ্যানে রূপান্তরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এমন কি চন্দ্রহাঁস ও বিষয়ার উপাখ্যান যাহা বাঙ্গালা মহাভারতে পাই, সেইরূপ গল্পও ইয়ুরোপে অনেক জায়গায় প্রচলিত আছে, ইহা ছাড়া বাঙ্গলার কত পুরাতন রূপকথার মত গল্প যে "গ্রীম-ভ্রাতৃদ্বয়ের" পুস্তকে পাওয়া যায় তাহার সীমা সংখ্যা নহে। আমরা বলিতেছি না যে বঙ্গদেশ হইতে এই গল্পের সকলগুলিই বিদেশে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল, বাঙ্গালী নাবিকেরা যখন ভয়ানক সমুদ্র ঢেউএর বুক বিদীর্ণ করিয়া ডিঙ্গা চালাইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিত, তখন তাহারা যেমন ঢাকাই

মসলিনের পৃথিবীময় কারবার করিত, সেই সঙ্গে ঐ সকল গল্পেরও আমদানী রপ্তানি হইত, তাহারা বানিজ্য করিতে যাইয়া দেশের গল্প। দেশের আমোদ-প্রমোদের কথা যেরূপ বিদেশে ছড়াইয়া আসিত, বিদেশী গল্প ও রূপকথাও তেমনই কিছু লইয়া আসিত। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহারা বেশীর ভাগই দিয়া আসিত। কারণ বাঙ্গালীর মত সূক্ষ্ম কারিগরী, কল্পনার সূক্ষ্ম বুননি, যাহার বাহাদুরী মসলিনের সূতার চাইতে হীন নহে, তাহা আর কোন জাতি দেখাইতে পারিয়াছে? মালঞ্চ-মালার গল্পের ন্যায় রূপকথা আর কোন জাতি বলিতে পারিয়াছে?

কিন্তু যেদিন বাঙ্গলা পরাধীনতার বেড়ী পায়ে পড়িল, সেই দিন হইতে বিদেশে আনাগোনা বন্ধ হইয়া গেল, সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গালী পরদেশে যাওয়ার উচ্চ আশা ছাড়িয়া দিয়া নিজের ঘর সামলা-ইতে লাগিয়া গেল।

সংস্কৃত-প্রধান সাহিত্য অনুবাদ লইয়াই প্রধানতঃ ব্যস্ত থাকিলেও সেই অনুবাদ উপলক্ষ করিয়া নিজ-দেশের কথাই শুনাইতে লাগিলেন। বাঙ্গালী মুখস্থ-

গং আওড়াইয়া কোন কালেই ক্ষ্যান্ত হন নাই। ধীরে ধীরে রামায়ণের মধ্যে তাঁহারা নিজের কথা ঢুকাইতে সুরু করিয়া দিলেন। কৃত্তিবাস রামায়ণ খানি কি রকম লিখিয়াছিলেন, এখনও তাহা ঠিক জানা যায় নাই। কিন্তু এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া আমরা যে বইটি পড়ি, তাহা অনেকটা অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। "কবিচন্দ্র" নামক এক লেখক 'অঙ্গদ রায়বার'টি কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন এবং সম্ভবতঃ ইনিই লঙ্কাকাণ্ডটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লিখিয়া ফেলিলেন। কোথায় রহিল পড়িয়া নরবানর রাক্ষসের ঘোর সিংহানদ, ভীষণ যুদ্ধ!—কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডে মৃদঙ্গ লইয়া ভক্তগণ নাম সংকীর্ত্তন সুরু করিয়া দিলেন। কোন কোন রাক্ষস পরিপাটী করিয়া তিলক কাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে নামের ছাপ দিয়া রামের কাছে গড়ুর পক্ষীর মত জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইলেন, কোন রাক্ষস রামের স্তোত্র পড়িয়া তাহার নিকট নিজের জীবন নিবেদন করিয়া দিলেন। স্বয়ং রাবণ রাজা "জন্মিয়া ভারত-ভূমে আমি দুরাচার, করেছি পাতক কত সংখ্যা নাহি তার" বলিয়া নিতান্ত অনুতপ্তের ন্যায় পরিতাপ করিতে

লাগিলেন। বৃদ্ধ বাল্মিকীর সুর একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়া বাঙ্গালীকবিরা রণক্ষেত্রকে সংকীর্ত্তন ভূমিতে পরিবর্ত্তন করত,—নামকীর্ত্তন ও খোল করতাল বাদন করিতে লাগিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙ্গালীর শক্তি কতটা, তাহা ইহা দ্বারাই বেশ বোঝা যায়; তাঁহারা বাল্মিকীকে পর্য্যন্ত নিজের ভাবে গড়িয়া লইল। যে কেহ বঙ্গদেশে আসিবেন, তাহাকে বাঙ্গালীর বেশভূষা পরিতে হইবে,— মারোয়ারী হউন, বিহারী হউন কিম্বা পুণার লোকই হউন, বাঙ্গলায় আসিলে বাঙ্গালী বণিতে হইবে। আগেকার দিনে সাহেবেরা পর্য্যন্ত ঢাকাই কাপড় পরিতেন এখন প্রভুত্ব দেখাইতে যাইয়া গায়ের জোরে তাহা ছাড়িয়াছেন, যদিও তাহা ছাড়িয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছেন। বৃদ্ধ বাল্মিকী বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আসিয়াছেন, কৃত্তিবাসের সঙ্গে বঙ্গীয় কবিরা একত্র হইয়া রামায়ণের যে রূপান্তর সাধন করিয়াছেন, সেই পুঁথিখানি সমস্তই কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে বাজারে বিকাইতেছে। কৃত্তিবাসের পরে রঘুনন্দন গোস্বামী নামে এক কবি প্রায় ২২৫ বৎসর পূর্ব্বে আর একখানি রামায়ণ রচনা করেন,

তাহা রামায়ণকে একেবারে বাঙ্গলার ঘরের জিনিষ করিয়া ফেলিয়াছে—উহাতে বাঙ্গালী বিবাহ-পদ্ধতি, পাঠশালার রীতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার সমস্ত ঢুকিয়া পুস্তকখানি বাঙ্গালী জীবনের একখানি চিত্র-পটের মত তৈরী করিয়াছে। বাঙ্গালীর মহাভারতেও শ্রীবৎস-চিন্তা প্রভৃতি নানা গল্পগুজব ঢুকিয়াছে। বাঙ্গালী অন্য ভাষার ভাণ্ডার হইতে বুঝিয়া শুঝিয়া ধনরত্ন আনিয়াছে, যাহা ব্যবহার করিতে পারিবে—তাহাই আনিয়াছে, তদতিরিক্ত কিছু আনে নাই, যাহা আনিয়াছে তাহা নিজের মতন করিয়া গড়িয়া পিটিয়া লইয়াছে—এইখানেই বাঙ্গালীর বাহাদুরী।

ব্রাহ্মণ-প্রধান যুগে ভক্তি, প্রেম, নিষ্ঠার সাধনা চলিল, কিন্তু সেই সঙ্গে জাতি-ভেদের আঁটা-আঁটি বিষম হইল। ব্রাহ্মণেরা সমস্তশাস্ত্র নিজেরা দখল করিয়া লইলেন,—সাধারণ লোকেরা জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ব্রাহ্মণের কাছে হাত পাতিয়া যাহা কিছু পাওয়ার পাইত, তাহাদের নিজেদের বিদ্যা পাঠশালার শুভঙ্করী ছাপাইয়া উঠিতে পারিত না। ব্রাহ্মণেরা নানারূপ মিথ্যা গল্প বলিয়া সাধারণ লোককে ভুলাইয়া রাখিতেন,

বাসুকী মাথা নাড়া দিলে ভূমিকম্প হয়, মাঘে মূলা খাইলে পিতৃহত্যার পাতক হয়, এইরূপ যা তা পাঠ দিয়া সাধারণ লোকদের জ্ঞানের দরজায় ঢুকিতে বাধা দিতেন,—ব্রাহ্মণ শাসন বড়ই কঠিন হইয়া উঠিল, এদিকে তান্ত্রিকগণ মদ্য মাংস লইয়া নানারূপ জঘন্য আচার করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

এই সময় সর্ব্বসাধারণকে প্রেমধর্ম্ম শিখাইতে এবং জাতিভেদের শক্ত বাঁধনের মূলে কুঠারাঘাত করিতে এক মহাপুরুষ বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি যেমন সমাজের একদিক্ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িলেন, তেমন সাহিত্যেরও একটা ওলট পালট করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা বলিবার পূর্ব্বে কয়েকজন বৈষ্ণব কবির কথা তোমাদিগকে বলিব, কারণ এই বৈষ্ণব কবিরাই আগমনী গান করিয়া সেই মহাপুরুষের আবির্ভাবের আভাস দিয়াছিলেন।

তোমাদিগকে প্রথম বলিয়াছি, কিঞ্চিন্ন্যূন ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে জয়দেব নামে এক বিখ্যাত কবি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার গান সংস্কৃতে লিখিয়া গীত-গোবিন্দ নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের ভাষা বড় মধুর, ইহার ভাব

জায়গায়, জায়গায় খুব শুদ্ধ ও উচ্চ, কিন্তু আবার এক এক জায়গায় এতটা লজ্জাস্কর, যে ছেলেদের তাহা শুনিতে নাই। গীতগোবিন্দ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র খুব আদর লাভ করিয়াছিল।

পাড়াগাঁয়ে ইতর লোকেরা জয়দেবী কবিতার ভাব লইয়া রাধাকৃষ্ণ-লীলার গান বাঙ্গলায় বাঁধিয়াছিল। অনুমান হয়, প্রায় ১০০০ বৎসর যাবৎ এই সকল গান বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত।

এই সকল গান এতটা অশ্লীল ও খারাপ যে মেয়েদের কাছে তাহার সকলগুলি গান করা চলিত না, সেই সকল গান গ্রামের বাহিরে যাইয়া ইতর লোকেরা গাহিত। এই গানের নাম ছিল "কৃষ্ণ-ধামালী" ধামালী শব্দটি নানারূপে ব্যবহৃত হইত, "ডাম্বাডোল" "ধুম্বল" "ঝুমুর"— শব্দগুলি ঐ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এখনও রংপুর অঞ্চলে "কৃষ্ণ-ধামালী" চাষারা গাহিয়া থাকে।

প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস নামে এক মস্ত বড় কবি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐ সকল কৃষ্ণ-ধামালীর ভাব গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন নামে এক কাব্য রচনা করেন। তিনি সংস্কৃতে

সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণ-ধামালীর ভাবগুলিকে তিনি সংস্কৃতের সাহায্যে কতকটা পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যৌবনে রামী নাম্নী এক ধুবনীকে ভাল বাসিয়া ফেলেন বাশুলী নাম্নী এক দেবীর মন্দিরের তিনি পুরোহিত ছিলেন। সেই দেবীর নিকট তিনি অনেক কান্নাকাটি করিয়া প্রার্থনা করেন যে এই হীন প্রেম হইতে দেবী যেন তাহাকে রক্ষা করেন। কিন্তু দেবীর স্বপ্নাদেশ হয়—"এই রামী ধুবনীই তোমার গুরু" ইহাকে ভাল বাসিয়া তুমি যে তত্ত্ব শিখিবে, আমার মত শত শত দেবদেবী এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণুও তোমাকে সেই তত্ত্ব শিখাইতে পারিবেন না।

চণ্ডীদাস এই প্রেমের জন্য সমাজে নিন্দিত হন, এবং জাতি-চ্যুত হইয়া যান। একবার তাঁহার কোন রাজ বন্ধুর অনুরোধে এবং তাহার ভ্রাতা নকুলের পীড়া-পীড়িতে তিনি রামীকে ছাড়িয়া কুলে উঠিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবেন,তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে তিনি থালা হাতে লইয়া ভোজন স্থানে যাইতেছিলেন, এমন সময়

রামীর মুখে তাঁহার নিজের গান গীত হইতে শুনিয়া থালা ফেলিয়া দিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে রামীর কাছে যাইয়া বলিলেন "আমি পারিব না, আমি তোমাকে ফেলিয়া জাতে উঠিতে পারিব না।" গৌড়ের মুসলমান সম্রাট তাঁহার গানের যশঃ শুনিয়া তাঁহাকে নিজ-সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান, সেইখানে বাদসাহের বেগম তাঁহার গান শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগী হন, এই অপরাধে বাদসাহ তাহাকে হাতীর পিঠে বাঁধিয়া অতি নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলেন। তাঁহার মৃত্যুর দৃশ্য দেখিয়া বেগমের জ্ঞান চলিয়া যায়—এবং অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞানের সঙ্গে প্রাণও চলিয়া যায়।

এই হইল চণ্ডীদাসের দুঃখময় জীবনের ইতিহাস। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের শেষের দিক্ হইতে চণ্ডীদাসের নিজের অপূর্ব্ব সুর জাগিয়া উঠিয়াছে,—ইহার পূর্ব্বে তিনি "কৃষ্ণ-ধামালী"র অনুকরণ করিতেছিলেন এবং জয়দেবের শব্দ-সম্পদে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এজন্য শেষের লেখা এবং পূর্ব্বে লেখায় তাঁর এতটা প্রভেদ। চণ্ডীদাসের সেই শেষের সুরে যে প্রেম গান হইয়াছে—তাহাতে

"কাম গন্ধ নাই"—তাহা নিকষিত হেম। সেই সকল গানের ভাষা সহজ, ভাব গভীর, স্বীয় মর্ম্ম-বেদনা ও দেহ মন-সমর্পণের কথায় সেগুলি অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। চণ্ডীদাস যে রাধিকার ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাতে সুখ-দুঃখের কথা নাই, তিনি সুখ-দুঃখ কৃষ্ণকে দিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রতিটি গান কৃষ্ণের রূপের এক একটি ধ্যানের মত। জগতে যাহা কিছু কালো, তাহাই তাঁহার চোখে ভাল লাগিত, কারণ কালো রং কৃষ্ণের মনভুলানো রূপ স্মরণ করাইয়া দিত, এই জন্য তিনি—

"এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, দেখয়ে
খসায়ে চুলে।

আকুল নয়নে, চাহে মেঘ-পানে
কি কহে দু'হাত তুলে।

এক দৃষ্টি করি, ময়ূর-ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরক্ষণ।"

চুল হইতে ফুলের মালা ফেলিয়া দিয়া তিনি আবিষ্ট ভাবে খোলা চুলে কালো রংএর শোভা দেখিতেন এবং নূতন মেঘের স্নিগ্ধ বর্ণ দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়া

ভ্রম করিতেন। কৃষ্ণকে কাছে পাইয়াও তিনি সোয়াস্তি পাইতেন না। কৃপণ যেরূপ দুর্লভ রত্ন পাইলে পাছে তা হারাইয়া যায় এই আশঙ্কা করিয়া থাকে,—রাধার মনে সর্ব্বদা সেইরূপ একটা আশঙ্কা থাকিত। এই জন্য তিনি নিজের মনের শত শত কষ্টের কথা বলিয়া শেষে বলিতেছেন,—

"বঁধু তুমি মোরে যদি নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।"

ইহার অর্থ তোমার প্রেমের বলে সকল কষ্ট হাসি-মুখে সহিয়াছি, কিন্তু তুমি যদি নিষ্ঠুর হও তাহা মুহূর্ত্ত-কালও সহিতে পারিব না। তোমার সম্মুখেই প্রাণ দিব। আর এক জায়গায় রাধা বলিতেছেন, আমি যেখানে যাই, যা কিছু করি—সর্ব্বদা তোমার মুখ মনে পড়ে, তোমারই মুখের হাসি মনে হইলে জুড়াইয়া যাই—কোন কষ্ট মনে স্থান পায় না—

"যথা তথা যাই আমি যতদূর চাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই।"

তিনি কৃষ্ণকে কত ভাল বাসিতেন—তাহা অতি সরল কথায় জানাইয়াছেন—

"আমি নিজ সুখ দুঃখ কিছু না জানি।
তোমার কুশলে কুশল মানি।"

ভাবিয়া ভাবিয়া এই দুটি ছত্র পড়িয়া দেখ—ভালবাসার জগতে ইহার অপেক্ষা বড় কথা হইতে পারে না। এই উচ্চভাবের দরুণ চণ্ডীদাসের পদগুলি স্তোত্রের ন্যায় শোনায়। রাধা কৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছেন তুমি আমি ভগবানকে সেই কথা বলিতে পারি, সে সকল কথা সরল ও সহজ হইলেও অতি উচ্চ সাধনার কথা—

"কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু, তিল তুলসী দিয়া।"

ইহার অর্থ রাধা তিল-তুলসী দিয়া কৃষ্ণকে দেহ দান করিয়া দিতেছেন। তিল তুলসী দিয়া যে দান করা যায়, তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না—তাহা একেবারে শেষ দান। দেহ কৃষ্ণকে দান করা কত শক্ত কথা, তাহা বুঝিতে পার। ভগবানকে যে শরীর দিয়াছে, সে তা আর তাহা নিজের ইচ্ছামত

ব্যবহার করিতে পারিবে না,—চোখ, কাণ, হাত, পা সমস্ত ভগবানের ইচ্ছায় নিয়োগ করিতে হইবে—ইহা কত বড় শক্ত কথা—তোমরা ভগবৎ সাধনা করিতে পারিলে বুঝিতে পারিবে।

নান্নুরে যখন চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলার পদ লিখিয়া বাঙ্গলাদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সময় মিথিলায় বিসফি গ্রামে গণপতি ঠাকুরের পুত্র বিদ্যাপতিও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অনেক পদ লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি সংস্কৃতে অনেক কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর মূল্য মিথিলার লোকদের অপেক্ষা বাঙ্গালীরাই বেশী বুঝিয়াছিল। আদত মিথিলার পদ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালী কবিরা সেই কবিতাগুলির ভাষা কতকটা বাঙ্গলার মত করিয়া লইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অপেক্ষা সম্ভবতঃ বয়সে ছোট ছিলেন এবং চণ্ডীদাসের মৃত্যুর পরও বহুদিন জীবিত ছিলেন। মিথিলার রাজা শিবসিংহ ও তাঁহার রাণী লছিমা দেবীর প্রশংসা ও পুরস্কার পাইয়া বিদ্যাপতি কবিতা লিখিতেন, —শিবসিংহ ইহাকে 'নব জয়দেব' উপাধি দিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির উপমাগুলি বড়ই সুন্দর; তাঁহার কবিতার

শব্দ-সম্পদ অমূল্য ; রাধিকার প্রেমে ঢুলুঢুলু দুটি চোখের কথা বলিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন—

"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধুমাতল কিয়ে উড়ুই না পার।"

চক্ষু দুটি যেন নিশ্চল ভ্রমরের মত, তারা মধুতে মত্ত হইয়া আছে, উড়িতে পারিতেছে না। কেমন সুন্দর উপমা! রাধিকা ভিজা চুলে যমুনায় স্নান করিয়া ফিরিতেছেন, কবি বলিতেছেন—

"চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মেঘ বরিষে যেন মোতিম হারা।

চুল হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে, মেঘ হইতে যেন বিন্দু বিন্দু মুক্তা ঝরিয়া পড়িতেছে! এটিও কি সুন্দর উপমা নয়!

কবি ভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি জীব তোহে সমায়ত,
সাগর লহরী সমানা।"

এক এক ব্রহ্মার আয়ু কোটি কোটি মানুষের আয়ুর তুল্য, সেইরূপ কত কত ব্রহ্মার জন্ম ও লয় হইয়া গেল, কিন্তু হে দেব! তোমার আদি-অন্ত নাই, জীব তোমাতেই জন্মিতেছে এবং তোমাতেই লয় পাইতেছে—ঢেউ যেন সাগরে জন্মিয়া সাগরেই মিশাইয়া যাইতেছে।"

বিদ্যাপতির নামে যে দুইটি উৎকৃষ্ট কবিতা চলিতেছে তাহা সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির রচিত নহে। তাহার একটি এই—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোহি মধুর বোল শ্রবণ হি শুনিনু
শ্রুতি পথ পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়িনু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখিনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥"

আর একটি রাস্তা ঘাটে মৃদঙ্গ ও মন্দিরা বাদনের সঙ্গে বৈষ্ণব ভিখারীরা সর্ব্বত্র গাহিয়া থাকে। সেটি এই—

"মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব।"
ইত্যাদি।

গঙ্গার তীরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। উভয়ে ভগবৎ প্রেম সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের পর বিদ্যাপতির কবিতার সুর বদলাইয়া গিয়াছিল, এতদিন ইনি উপমা, শব্দের মাধুর্য্য ও বর্ণনা-কৌশল লইয়া ব্যস্ত ছিলেন চণ্ডীদাসের প্রভাবে তাঁহার রচনায় ভক্তির সুর জমিয়া গিয়াছিল। বিদ্যাপতির ভাব-সম্মিলনের পদগুলি ভক্তি প্রেমে মাখা। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হইলেও তাঁহার লেখাগুলি আমরা কতকটা বাঙ্গলা করিয়া লইয়াছি। এই আধ-বাঙ্গলা, আধ-হিন্দী মূর্ত্তিতে, এই হর-গৌরী রূপে তিনি চিরকালই বাঙ্গালা কবিদের মধ্যে আসন পাইবেন। পদ-কল্পতরু প্রভৃতি সমস্ত পদ-সংগ্রহ পুস্তকে ইহাকে আমরা বাঙ্গালী কবি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি ; এই পাঁচ শত বৎসর ইনি বাঙ্গলায় থাকিয়া আমাদের একজন হইয়া গিয়াছেন। স্বয়ং চৈতন্যদেব

দিবারাত্র জয়দেব, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদ গান করিতেন, সুতরাং তিনি শুধু রসিক ও প্রেমিকদের একজন বলিয়া নহেন, বাঙ্গলার ঠাকুর ঘরেও আমরা তাঁহাকে বিশিষ্ট একটা আসন দিয়াছি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যদেব

যখন জয়দেবী গীতি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও নরহরি সরকারের পদাবলী—ঘরে ঘরে গীত হইতেছিল, যখন পাড়াগাঁয়ের চাষারা 'কৃষ্ণ-ধামালী' গাইয়া বাঙ্গলার আম কাঁঠালের ছায়া-শীতল গ্রামগুলিতে কৃষ্ণ-ভক্তির একটা বৃহৎ জমি সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন হঠাৎ নবদ্বীপে গুরু গুরু শব্দে প্রেমের মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল,—এবং অল্প সময়ের মধ্যে দেশময় কৃষ্ণকথার বাণ আনিয়া ফেলিল। কৃষ্ণ-কথার কল্পতরু, হরিনামের মূর্ত্তি চৈতন্য ১৪৮৬ ইং সনে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট বাসী ছিলেন, আরও কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা উড়িষ্যায় জাজপুরবাসী ছিলেন, চৈতন্যের মাতা শচীদেবীও শ্রীহট্ট বাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা ছিলেন,কিন্তু ইহারা নবদ্বীপে আসিয়াই শেষে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার কলা শিল্পের কোমলতা, পূর্ব্ব-বঙ্গের আগ্রহ এবং পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এই

তিন উপাদান মিশিয়া যেন চৈতন্যদেবের ভক্তিকে অসামান্যরূপে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিল।

চৈতন্যদেব পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার মত বহু ভাষাবিৎ লোক তখন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। তিনি নবদ্বীপের টোলে সংস্কৃত ও পালী শিখিয়াছিলেন, তিনি তেলেগু, তামিল ও মলয়ালমে কথা বার্ত্তা বলিতে পারিতেন,—তামিল ভাষায় দাঁড়াইয়া তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন, উড়িষ্যা মৈথিল ও হিন্দীতে সর্ব্বদা গান করিতে পারিতেন। তিনি এই অসাধারণ পাণ্ডিত্য লইয়া যাঁহাদের সঙ্গে বিচার করিতে লাগিয়া যাইতেন, তাঁহারা তাঁহার প্রতিভায় বিস্মিত হইয়া যাইতেন। ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি প্রায়ই‘হরি’‘হরি’বলিয়া কাঁদিতেন এবং নৃত্য করিতেন। যাহারা তাঁহার মুখে হরিনাম শুনিত,তাহারা যেন হরিকে প্রত্যক্ষ করিত। তিনি মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণ ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে যাইতেন, নদী দেখিলেই তাঁহার কৃষ্ণলীলাময় যমুনার জল মনে পড়িত, তমালকে জড়াইয়া ধরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিত, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না,—তাঁহার

মূর্ত্তি ছিল পরম সুন্দর,এবং তিনি যখন'হরি' 'হরি' বলিয়া কাঁদিতেন, তখন মনে হইত যেন নারদের বীণা বাজিতেছে,কিংবা বাগ্দেবী যেন নিজে হরিরনাম গাহিতেছেন।

তিনি অনেক সময়ই বক্তৃতা দিয়া হরিভক্তি বুঝাইতেন না। খুব সুন্দরী রমণীকে দেখিলেই যেরূপ লোকের চক্ষু মুগ্ধ হয়, কোন ব্যাখ্যার দরকার হয় না, গোলাপের সৌরভ যেরূপ কথা দিয়া বুঝাইতে হয় না, সেইরূপ তাঁহার ভক্তি-ব্যাখ্যার দরকার হইত না, লোকে তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি কি তাহা বুঝিত।

স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে লোকে ভালবাসিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রী-কন্যা পুত্র অপেক্ষা শতগুণ বেশী যে ভগবানকে ভালবাসা যায়,—তিনি তাহাই তাঁহার জীবন দিয়া বুঝাইয়াছেন।

ব্রাহ্মণ্য-প্রধান যুগের তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, ব্রাহ্মণের সার ভক্তি ও সার নিষ্ঠা তিনি জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের জাতিভেদ, অহঙ্কার ও ঘৃণা তিনি গ্রহণ করেন নাই, বরং তিনি বলিয়াছেন— যদি তুমি মানুষকে ঘৃণা কর, তবে ভগবৎ ভক্তি পাইবে না।

"প্রভু কহে যে জন ডোমের অন্ন খায়।
হরিভক্তি হরি সেই পায় সর্ব্বদায়॥"

অর্থাৎ ডোমকে তুমি কুকুরের মত গণ্য কর, এই ঘৃণা মন হইতে যতদিন দূর করিতে না পারিবে, ততদিন তোমার হরিভক্তি লাভ করা দুরাশা।

তিনি সেবা-ধর্ম্মের গুণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন,—গঙ্গার ঘাটে কাহারও সাজি নিজে মাথায় করিয়া মুটের মতন বহন করিয়া আনিয়া দিয়াছেন, কাহারও ভিজা কাপড় নিংড়াইয়া দিয়াছেন, কাহারও পা ধুইয়া দিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ, এই জন্য দাঁতে জিভ কাটিয়া যদি কেহ বাধা দিতে যাইতেন, তখন তিনি বলিতেন তোমাদিগকে সেবা করিলে হরিভক্তি লাভ হয়—আমাকে বাধা দিও না। পুরীতে একবার বহুলোক একত্র হইয়া বিষ্ণুমন্দির পরিষ্কার করিয়াছিলেন, দেখা গেল যে, উপবাসে ক্ষীণ-দেহ চৈতন্যের বোঝাই সকলের অপেক্ষা বড়। মুন্নাগ্রামে তিনি একটি দরিদ্র নিরন্ন বুড়ীর জন্য ভিক্ষা করিয়া কাপড় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যখন তিনি হরিনাম করিতে থাকিতেন, তখন যেন স্বর্গ পৃথিবীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। জগাই,মাধাই, ভীল-

পন্থ, নারোজি প্রভৃতি কত দস্যু তাঁহার ভক্তি-প্রেম দেখিয়া উদ্ধার পাইয়াছিল! ইন্দিরা, বারমুখী প্রভৃতি বেশ্যা, তীর্থ-রামের ন্যায় কত লম্পট তাঁহার মুখে হরি-নাম শুনিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিল—তাহা তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিলে জানিতে পারিবে। তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস কিরূপ ছিল, তাহা এই কয়টি ছত্রে কিছু বুঝিতে পারিবে। তখন তিনি বোম্বাই প্রদেশে—

"এত বলি কৃষ্ণহে বলিয়া ডাক দিল।
সে স্থান অমনি যেন বৈকুণ্ঠ হইল॥

অনুকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল।
দলে দলে গ্রাম্য লোক আসি দেখা দিল॥

ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি।
অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌর হরি॥

প্রভুর মুখের পরে সবার নয়ন।
ঝর্ ঝর্ করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥

বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিলা নাম মিলিয়া সকলে॥

পশ্চাৎ ভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া।
শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া॥

নারীগণ অশ্রুজল মুছিছে আঁচলে।
ভক্তিভরে হরিনাম শুনিছে সকলে॥

অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া॥

উড়িষ্যার সম্রাট প্রতাপরুদ্র, সাতগাঁয়ের ক্রোড়পতি রঘুনাথ দাস, হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী সনাতন প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি,তাঁহার 'দাস' বলিয়া নিজদিগকে পরিচয় দিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। এদিকে কাশীর সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী, বাঙ্গলা-বেহার উড়িষ্যার পণ্ডিতরাজ বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও দাক্ষিণাত্যের সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ঈশ্বর ভারতীও ভর্গদেব চৈতন্যকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন। স্বয়ং সম্রাট আকবর সাহ চৈতন্য দেবের স্তুতি-পূর্ব্বক গান রচনা করিয়াছেন। চৈতন্য-দেবের সহচর ছিলেন নিত্যানন্দ, রূপ সনাতন, রঘুনাথ গোপাল ভট্ট, অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস নরহরি প্রভৃতি। ইহারা

বাঙ্গলাদেশে যে প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার প্রবাহ সমান আবেগে চলিতেছে। চৈতন্যদেব ২৩ বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ৬ বৎসর উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণাত্যে পর্যটন করেন এবং ১৮ বৎসর পুরীতে বাস করেন। ইং১৫৩৩ সনে আষাঢ় মাসে রথের সময় সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ইটে পায়ের একটা জায়গায় চোট লাগে তাহাতেই জ্বর হইয়া তিনদিন পরে তিনি তিরোহিত হন।

———
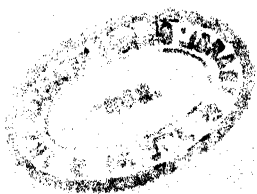
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব-সমাজ

চৈতন্য প্রভু ও তাঁহার সহচরদের জীবনের কথা লইয়া বড় বড় বই লেখা হইয়াছে। তাহা পড়িলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, হিন্দু সমাজ ও এ দেশের পুরাণা ইতিহাস অনেক জানিতে পারিবে।

এই সকল পুস্তকের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় গোবিন্দ দাসের করচাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গোবিন্দদাস জাতিতে লোহের কর্ম্মকার ছিলেন, তিনি বর্দ্ধমান, কাঞ্চননগর বাসী ছিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী শশীমুখীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ী ত্যাগ করেন এবং চৈতন্যদেবের শরণ লয়েন। ইং ১৫১০ হইতে ১৫১১ পর্য্যন্ত তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে পর্য্যটন করেন। এই দুই বৎসরের ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি খুব সরল ও সুন্দর ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন চৈতন্যদেব আমাদের চোখের সামনে আসিয়াছেন, —তাহার মুখের হরিনাম যেন কাণের কাছে শুনিতে পাই। লেখাটি বড়ই চমৎকার।

ইং ১৫৭৩ সনে বৃন্দাবন দাস নামক এক ব্রাহ্মণ 'চৈতন্য ভাগবত' রচনা করেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের সঙ্গী শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র ছিলেন। এই পুস্তকখানি বৈষ্ণব সমাজে খুব আদৃত। ইহাতে বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন সমাজের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বর্দ্ধমান ঝামটপুর-বাসী বৈদ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতই বৈষ্ণব ঐতিহাসিক পুস্তকগুলির মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণদাস ১৬ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ৮৭ বৎসর বয়সে তিনি চৈতন্য চরিতামৃত লিখিতে সুরু করিয়া ৯৩ বৎসরে সমাধা করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা আছে এবং ইহাতে যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে, বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কোন পুস্তকে সেরূপ অসামান্য বিদ্যাবত্তা দেখান হয় নাই। এই পুস্তক ভক্তি-প্রেমের অফুরন্ত নির্ঝর, অধ্যবসায়ের কল্পতরু বিশেষ। চৈতন্যচরিতামৃত ইংরাজী ১৬১৫ সালে লিখিত হয়।

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, লোচন দাসের চৈতন্য-

মঙ্গল প্রভৃতি আরও কয়েকখানি চৈতন্যের জীবন-চরিত বাঙ্গালাদেশে গত ৩৪০ কিম্বা ৩৫০ বৎসর যাবৎ আদর পাইয়া আসিয়াছে। তোমরা এই সকল বই ভাল করিয়া পড়িলে বুঝিতে পারিবে, কেন নবজাত শিশুকে 'নবদ্বীপচন্দ্র', 'নদেরচাঁদ','নগরবাসী','গৌরচন্দ্র','গোরা' প্রভৃতি নাম দিয়া এখনও বাঙ্গালা দেশের পিতামাতা সেই ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বেজাত শিশুটির প্রতি ভালবাসা জানাইয়া থাকেন।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি সঙ্গীরাও স্বর্গগত হন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বৈষ্ণব-সমাজ কতকটা নিদ্রিতের মত পড়িয়া থাকে। তারপর শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিন ব্যক্তি বৈষ্ণব-সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। ইঁহারা তিনজনেই একত্রে বৃন্দাবনে যাইয়া জীব-গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র শিক্ষা করেন। রূপ, সনাতন, জীব-গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যদের একশত একুশখানি পুঁথি লইয়া বাঙ্গালাদেশে ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশে ইঁহারা রওনা হইয়া আসেন। পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের নিযুক্ত ডাকাতেরা

"রত্ন" ভাবিয়া সেই পুথির বাক্সগুলি লুট করিয়া লইয়া যায়। নরোত্তম ছিলেন রাজসাহী জেলার খেতুরির রাজপুত্র। তিনি ও শ্যামানন্দ বাঙ্গালাদেশে চলিয়া আসেন, কিন্তু শ্রীনিবাস পুস্তকগুলি ফিরিয়া পাইবার চেষ্টায় বন বিষ্ণুপুরে রহিয়া যান। রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন, তিনি সপরিবারে শ্রীনিবাসের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক সেই পুথিগুলি ফিরাইয়া দেন। শ্যামানন্দ উড়িষ্যায় যাইয়া তথাকার রসিকচন্দ্র নামক এক রাজাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষাদান করেন। এখন উড়িষ্যার অধিকাংশ রাজা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী; শ্যামানন্দই তাঁহাদের আদিগুরু। শ্যামানন্দ জাতিতে সদ্গোপ ছিলেন। নরোত্তম রাজপুত্র হইয়াও তাঁহার রাজত্ব খুল্লতাত কনিষ্ঠ ভাই সন্তোষ দত্তকে দিয়া নিজে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইয়া জীবনযাপন করেন। বহু ব্রাহ্মণ এবং রাজবৈভবশালী ব্যক্তি ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, ইনি কিন্তু কায়স্থ ছিলেন। ইঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে গড়েরহাটের রাজা চাঁদরায় ও সন্তোষরায়, পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহ এবং

সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রধান ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বনবিষ্ণুপুর হইতে শত শত লোককে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, ইহার কৃপায় বনবিষ্ণুপুরের রাজারা বৈষ্ণবধর্ম্মের এতদূর অনুরাগী হন, যে তাঁহারা নানারূপ কারুকার্য্য ভূষিত বিষ্ণুমন্দির তৈয়ারী করাইয়া বনবিষ্ণুপুরকে বিশেষরূপ শ্রীসম্পন্ন করিয়া তোলেন।

নরোত্তমের খুল্লতাত ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত খেতুরীতে বৈষ্ণবদিগের এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন, বঙ্গদেশের যাবতীয় বৈষ্ণব তথায় পাথেয় ও প্রণামী লাভ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই মহোৎসব ব্যাপারে সন্তোষ দত্ত তাঁহার রাজভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবদিগের এই সমস্ত ঘটনা কয়েকজন ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন খুবই প্রসিদ্ধ। নিত্যানন্দ দাস নামক একজন বৈদ্য লেখক "প্রেম-বিলাস" নামক একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক রচনা করিয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানাইয়া গিয়াছেন। এই সকল ঘটনার কোন

কোন বিষয় আরও বিস্তার করিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তী "নরোত্তম-বিলাস" ও "ভক্তি-রত্নাকর" নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। ভক্তি-রত্নাকর খুব বৃহৎ গ্রন্থ, ইহাতে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সেই সময়ের বৃন্দাবন ও মথুরার একটা ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া আছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব-পদাবলী

চৈতন্যের সময় এবং তাঁহার কিছুদিন পরে যে সকল পদাবলী রচিত হয়, তাহা বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

চৈতন্য প্রভুর প্রেম-লীলা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যাঁহারা সেই আশ্চর্য্য প্রেমের কথা শুনিয়াছিলেন তাঁহারাই এই পদাবলী রচনা করেন। এই পদে রাধার কথা যাহা লিখিত হইয়াছে—তাহা রূপক ছলে চৈতন্য প্রভুর প্রেমকেই অবলম্বন করিয়া। চৈতন্যের প্রেম এমনই চমৎকার ছিল, যে তাহা দেখিবা মাত্রই লোকের মনে কবিতার ভাব আসিত। এরূপ একটা প্রবাদ আছে যে চৈতন্য একদিন বিভোর হইয়া কৃষ্ণনাম গান করিতেছিলেন, তাঁহার সুর এমনই করুন—এমনই মিষ্ট ও এমনই আত্মবিহ্বল হইয়া কৃষ্ণ নামকে আশ্রয় করিয়াছিল, যে সেই সুর হইতে একটা রাগিণীর উৎপত্তি হইয়া গেল। সেই

রাগিণীর নাম "মায়ুর"। প্রেমাশ্রু পূর্ণ চক্ষে তিনি যে ভাবে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া কৃষ্ণকে খুঁজিতেন,—তিনি যেরূপ নির্ভরের ভাবে সখার কাঁধে এলাইয়া পড়িতেন, তাহা দেখিয়া কবিরা রাধার বর্ণনা এমন জীবন্ত করিয়াছেন—

"আজি কেন গোরা চাঁদের বিরস বদন।
কে আইল, কে আইল, বলি ডাকে ঘন ঘন॥"

প্রভৃতি পদে গৌরাঙ্গের সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, ঠিক সেইরূপ কথা রাধার সম্বন্ধেও পাওয়া যায়। রাধার ছবি অনেক সময়ই গৌরাঙ্গের কথা মনে করাইয়া দেয়। রাধামোহন ঠাকুর নামে একজন কবি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ চন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥
পুনঃপুনঃ গতাগতি করু ঘর পন্থ।
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত সুপ্রকাশ॥

পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধা মোহন কিছু না পাওল থেহ ॥"

পদকল্পতরু প্রথম শাখ ৬৮ নং।

ইহার সঙ্গে রাধা সম্বন্ধীয় এই পদটি মিলাইয়া পড়িয়া দেখ—

"ঘরের বাহির দণ্ডে শতবার
তিল তিল আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥

রাই এমন কেনবা হৈল।
গুরু দুরু জন ভয় নাহি মন
কোথায় বা কি দৈব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসায়ে পড়ে ॥"

অনেক জায়গায়ই রাধার ছবি এবং গৌরাঙ্গের ছবি

একই হইয়া গিয়াছে। কখন কখনও একটি গানই গায়ককে দুই ভাবেই গাহিতে শুনিয়াছি—

"গোরা কেন এমন হ'ল।
এই না কৃষ্ণ কথা কইতেছিল॥"

ঠিক এই গানটিই আবার—

"রাই কেন এমন হ'ল।
কৃষ্ণ কথা কইতে কইতে-
রাই কেন এমন হ'ল॥
ও বিশাখা, তোরা দেখে যা'—
রাই বুঝি প্রাণে ম'ল।"

এই আকার ধারণ করিয়াছে। আবার স্থানে স্থানে রাধার কথা বলিতে যাইয়া কবিরা গৌরাঙ্গ-জীবনের এমন স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন, যে তাহা রাধার সঙ্গে তেমন মানায় না, যেমন মানায় গৌরাঙ্গের সঙ্গে। রাধা গোপনে কৃষ্ণের নিকটে যাইতেছেন,—এই ভাবে গোপনে যাওয়াকে "অভিসার" বলে। জয়দেব প্রভৃতি কবিরা অভিসারের কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন-

"রাই তুমি নীল শাড়ী পর, তাহা হইলে রাত্রির আঁধারের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, কেহ তোমাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে না। ধীরে ধীরে যাইবে, নপুর ছাড়িয়া চল।" প্রভৃতি কথাগুলি গোপন ভাবে রাত্রিতে লুকাইয়া যাওয়ার পক্ষে খুবই সদুপদেশ।

কিন্তু অনন্তদাস নামক একজন কবি রাধার অভিসারের কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

"চৌদিকে রমণী সাজে।
ডম্ফ রবাব বাজে॥"

রাই সঙ্গিনীদের লইয়া যাইতেছেন, তাহারা ডম্ফ ও রবাব বজাইয়া যাইতেছে। এ যেন পাড়া জাগাইয়া যাওয়া, এও কি অভিসার হয়? কিন্তু অনন্তদাস যখন পদ লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রাণে ছিল চৈতন্য প্রভুর সংকীর্ত্তনের ছবি। চৈতন্য কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পাগলের মত নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছেন, সঙ্গিরা নানা বাদ্য বাজাইয়া চলিতেছে; এই ছবি তাঁর প্রাণে ছিল। কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যে একটা গোপন ব্যাপার—ইহা তিনি কি করিয়া বর্ণনা করিবেন।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী নামক একজন কবি, তাঁহার "রাই-উন্মাদিনী" নামক কাব্যের ভূমিকায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন,—যে গৌরাঙ্গের ভাবগুলিই তিনি রাধাতে আরোপ করিয়াছেন,—রাধার মুখে কৃষ্ণ বিরহে যে সকল বিলাপ প্রলাপ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যের মুখোচ্চারিত দেখা যায়।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা অনেকেই চৈতন্যকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহাকে ধ্যান করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। কীর্ত্তন গায়কেরা রাধাকৃষ্ণ লীলার পালা গাইবার পূর্ব্বে একটা করিয়া "গৌর-চন্দ্রিকা" গাহিয়া গান স্বুরু করে; যে লীলা তাহারা গাহিবে, তাহারই মতন গৌরাঙ্গের কোন ভাব তাহারা প্রথমে গাহিয়া লয়। তাহার অর্থ যাহারা গান শুনিবেন তাঁহারা যেন মনে না করেন, রাধাকৃষ্ণের লীলা সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা মাত্র,—উহা ভগবৎ প্রেম, যে প্রেম চৈতন্য নিজের জীবনে দেখাইয়াছেন, উহা তাহারই রূপক। গৌরচন্দ্রিকা শুনিতে শুনিতে যখন ভগবৎ প্রেমের ভাব সকলের প্রাণে জাগরিত হয়, তখন গায়কেরা রাধাকৃষ্ণের লীলা রস গাইতে আরম্ভ করেন।

প্রেম যিনি নিজ জীবনে এমন আশ্চর্য্য রকমের আগ্রহ-সহকারে দেখাইয়াছেন—তাঁহারই কথা লিখিতে লিখিতে পদকর্ত্তারা রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে এরূপ জীবন্ত করিতে পারিয়াছেন। এই প্রেম তাঁহাদের ধ্যানে পাওয়া। ইহা কবিরা অষ্টপ্রহর সংকীর্ত্তন ওয়ালাদের মুখে মুখে শুনিয়াছেন। নরোত্তম, রঘুনাথ প্রভৃতি রাজ-কুমারেরা রাজকুমারী রাধার ন্যায় গৃহ-সুখ বিসর্জ্জন করিয়া'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'বলিয়া কাঁদিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। সুতরাং কবিরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই এত সুন্দর করিয়া বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। এই বৈষ্ণব পদগুলি কল্পনার হাওয়ায় জন্মে নাই, গাঢ় অনুভূতির ক্ষেত্রে ইহাদের জন্ম। বহু সাধকের চোখের জলে ধৌত হইয়া—বহু ত্যাগের ভিত্তিতে দৃঢ় হইয়া,—অনেক তপস্যা ও আরাধনার ফলে—রাজপুত্রকে ভিখারী করিয়া,—পণ্ডিতের দর্পচূর্ণ করিয়া,—উপবাসে পবিত্র হইয়া,—গেরুয়ারূপ বিরাগের বেশ পরিয়া—তবে এই বঙ্গদেশে কৃষ্ণ-প্রেম জন্মিয়াছিল। এজন্য পদকর্ত্তা-দিগকে শুধু কবি বলিলে তাঁহাদের সমুচিত মান্য দেওয়া হয় না। এদেশ ইহাদিগকে 'মহাজন' নাম দিয়াছে।

এই পদকর্ত্তাদের মধ্যে কয়েকজন শুধু গৌরাঙ্গে-জীবনের কথা লইয়াই পদ রচনা করিয়াছেন। নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নরহরি চৈতন্যপ্রভুর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন, তাঁহার উপাধি ছিল সরকার এবং বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে। বাসুদেব ঘোষও চৈতন্যদেবের একজন প্রধান অনুচর ছিলেন।

যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ লীলা লইয়া পদ রচনা করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অনেক। বিদ্যাপতি ও চণ্ডী-দাসের পরে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা ছিলেন, গোবিন্দদাস। ইঁহার বাড়ী ছিল, বুধুরী গ্রামে। ইনি চৈতন্য-প্রভুর তিরোধানের পর প্রায় ৫০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। জীব-গোস্বামী ইহার একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। পদকর্ত্তারা বাঙ্গালায় সকল পদ রচনা করেন নাই, ইহারা হিন্দি-মিশ্রিত এক রকমের ভাষায়ও অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন; এই ভাষাকে চলিত কথায় ব্রজবুলি বলে। হিন্দীর মিশাল থাকার দরুণ বাঙ্গালা দেশের বাইরেও তাঁহাদের

গান সকলে বুঝিতে পারিবে, সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই ইহারা ব্রজবুলীতে পদ রচনা করিয়াছিলেন। গোবিন্দ-দাসের সময়ে আরও কয়েকজন পদকর্ত্তা খুব সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমরা দুই চারিটি পদ ও পদের অংশ তুলিয়া দিয়া এই পদকর্ত্তাদের কবিত্বের নমুনা দিতেছি।

"মন্দির তেজি যব পদ চারি আয়িনু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগ বেড়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুল-কামিনী তাহে কুহু-যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন পূর॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কিছু নাহি জানিনু
চির দুঃখ অব দূরে গেল॥

তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশিল
ছোড়ল গৃহ-সুখ আশ।
পন্থক দুঃখ তৃণ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস॥”

(২)

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পীরিতি লাগি স্থির নাহি বান্ধে॥
কি আর বলিব সই কি আর বলিব।
যে পণ ক'রেছি চিতে সেই সে করিব॥
ঘরের সকল লোক করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাব আগুনি॥

(৩)

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ন না চলে, নাচে হিয়ার পুতুলি॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়য়ে নিশ্বাসে॥

লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেন কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

(৪)

সিনান দুপুর সময়ে জানি।
তপত পথেতে ঢালে সে পানি॥
তাম্বুল খাইয়া দাঁড়ায় পথে।
কোথা হ'তে আসি বাড়ায় হাতে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদচিহ্ন তলে লুটে কানাই॥
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
(আর) সো যদি সিনাই আগিলা ঘাটে
পিছলি ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গজল পরশ লাগিয়া
বাহু পশারিয়া রয়॥

বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া
একই রজকে দেয়।
আমার নামের একটি আখর
পাইলে হরষে লেয়।
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়ে
ফেরয় কতই পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যেদিকে,
সেদিন সে মুখে থাকে।
মনের কাকতি বেকত করিতে
কত সে সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক শ্রীরায় শেখর
কিছু কহে অনুমানে।

তোমরা বড় হইয়া পদাবলীর ফুলবনে ঢুকিয়া দেখিবে, উহার সুঘ্রাণ স্বর্গ হইতে পাওয়া। অন্য অন্য ভাষায় স্ত্রী পুরুষের ভালবাসা লইয়া কত কাব্য রচিত হইয়াছে, সেগুলির সঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলীর একটা প্রভেদ আছে। অন্য অন্য স্থানে ভালবাসার সঙ্গে হিংসা আছে,—রাগ আছে,—অবিশ্বাস আছে। সে সকল জায়গায় ভাল-

বাসাও যেরূপ সত্য, সেই সঙ্গে রাগ—ত্যাগ—হিংসাও আবার তেমনই সত্য। রাগের বশে কত নায়ক কত নায়িকাকে হত্যা করিয়াছে, হিংসার আগুনে কতজন আবার পুড়িয়া মরিয়াছে। বৈষ্ণব কবির প্রেমেও রাগ আছে, তাহার নাম মান। এই মান যার উপর রাগ করে, তাকে তত ব্যাথা দেয় না, যতটা সে নিজে পায়। মান রাগের ছদ্মবেশ মাত্র। ইহাতে—

"এক চক্ষু বলে আমি কৃষ্ণরূপ হেরব।
আর চক্ষু বলে আমি মুদিত হয়ে রব॥"

বৈষ্ণব কবির প্রেমেও ত্যাগ আছে, সে ত্যাগের নাম "মাথুর।" তাহাতে কৃষ্ণকে রাধা যেরূপ পাইয়াছিলেন, এরূপ আর কিছুতেই পান নাই। "মাথুরে" বাহিরের কৃষ্ণ ঘরে আসিয়া একবারে মনের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মূল কথা বৈষ্ণব কবিদের প্রেম ফুলদলে তৈরী। ইহাতে রাগ—হিংসা—ত্যাগ সেই প্রেমের উপাদানেই গড়া, তাহাতে কাঠিন্য মাত্র নাই, যেহেতু এ প্রেম স্বার্থশূন্য।

আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রেম শরীরের কথা

বলিতে যাইয়া শুধু আত্মার সম্পদকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে। চৈতন্য-প্রভুর জীবন ভগদ্বদ্ভক্তির এক পৃষ্ঠা, আর বৈষ্ণব-পদাবলী সেই ভগবদ্ভক্তিরই আর এক পৃষ্ঠা। বৈষ্ণব-পদাবলীর অনেক সংগ্রহ-পুস্তক আছে, সেইগুলির মধ্যে বৈষ্ণবদাস রচিত পদকল্পতরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পুস্তকে ৩০০১টি পদ আছে এবং উহা প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

বৈষ্ণব-কবিদের যুগ চলিয়া গেল। তারপর কৃষ্ণচন্দ্র রাজার প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দরের পালা গীত হইতে লাগিল। বৈষ্ণব-সাহিত্য বৈষ্ণব-কবিগণের হাত হইতে সাধারণের হাতে আসিয়া পড়িল। আমরা বলিয়াছি,এই দেশে চণ্ডীদাসেরও পূর্ব্বে 'কৃষ্ণধামালী' গান হইত, সেগুলি অতিশয় অশ্লীল ও গ্রাম্য ভাষায় রচিত হইত, কৃষ্ণধামালী চাষারাই গাইত। যখন বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনীয়ারা বৈষ্ণব পদে তাঁহাদের প্রেমে অমৃত ঢালিয়া দিলেন, তখন রাধাকৃষ্ণ লীলা খুব উঁচু হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম কথা লিখিত হইতে লাগিল। বহুদিন কীর্ত্তনীয়াদের মুখে এই সকল গান শুনিতে শুনিতে চাষাদেরও অনেকটা শিক্ষা হইল।

তাই তাহারা যখন ফিরিয়া 'রাধাকৃষ্ণ লীলা' গান করিতে সুরু করিয়া দিল, তখন আর তাদের গানের ভাষায় সেরূপ অভদ্র কথা আর রহিল না। তাহারা সংস্কৃত জানিত না, অতি সরল কথায় তারা রাধাকৃষ্ণের গান বাঁধিতে লাগিল। কৃষ্ণধামালী দুইরূপ আকারে সাধারণ লোকের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিল। তাহার নাম হইল যাত্রা ও কবি। কবির দলে নিতান্ত ছোট জাত কৃষ্ণমুচি, নীলমণি পাটুনী এমন কি ফিরিঙ্গী এণ্টোনী পর্য্যন্ত ঢুকিয়া যশ উপার্জ্জন করিল। কবি-ওয়ালাদের মধ্যে হরু ঠাকুর ও রামবসুই শ্রেষ্ঠ। রাম-বাসীর বিখ্যাত গানটি অনেকেই জানেন।

মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হ'লনা।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জ রমণী বলি হাসিত লোকে,
সই ধিক্ তাকে, বল্‌ব বিধাতাকে
নারী জনম যেন আর দেয় না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না॥

হাসি হাসি যখন সে 'আসি বলে',
সে হাসি দেখে ভাসি নয়ন জলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,মন চাহে রাখিতে
লজ্জা বলে ছিছি ছুঁইও না।
"তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম স্বজনি।
অনায়াসে বিদেশে গেল সে গুণমণি ॥"

বাঙ্গালী লজ্জাশীলা বউটির কথা,—পিতামাতার কোল-ছাড়া নূতন ক'নে বউএর স্নেহ,—শিশুদিগের জন্য মায়ের মনের উৎকণ্ঠা,—এই সকল ভাব কখনও রাধা-কৃষ্ণ লীলার আড়ালে, কখনও পার্ব্বতীর আগমনীগানের মধ্য দিয়া,কখনও বা খোলাখুলি ভাবে—বাঙ্গালী কবিও যাত্রার গানে ফুটিয়া উঠাইয়াছে। তাহা অনেক সময় ঠাকুর দেবতার কথার উপলক্ষ লইয়া বাঁধা হইলেও সেগুলি যে বাঙ্গালীর ঘরের ও মর্ম্মের কথা তাহা বুঝিতে দেরী হয় না।

"তুমি যে কয়েচ গিরিরাজ
আমার কতদিন কত কথা।
সেকথা শেল সম
আছে আমার হৃদয়ে গাঁথা ॥

আমার লম্বোদর নাকি
উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াত।
হোয়ে অতি ক্ষুদার্ত্তিক
সোণার কার্ত্তিক ধূলায় পড়ে লুটাত ॥"

এইরূপ বহু গান দরিদ্র বাঙ্গালী ঘরের দিকেই সঙ্কেত করিত, দেবদেবীর কথা লইয়া সুরু করিয়া নিজেদের ঘরের দুঃখই বলিয়া সকলকে কাঁদাইত।

ইংরাজী ১৮০৪ সালে বর্দ্ধমানে বাঁদমুড়া গ্রামে দাশরথী রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাঁচালী নামক একরূপ ছড়ার সৃষ্টি করেন, তাহাতে শীঘ্রই সমস্ত বাঙ্গালাদেশ মাতিয়া উঠে। ভাষার উপর তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল, আসরে দাঁড়াইলে তাঁহার মুখ হইতে কবিতার ফুল বর্ষণ হইতে থাকিত—অর্জ্জুন যেরূপ কুরুক্ষেত্রে বাণের উপর বাণ ছুড়িয়া বিপক্ষকে চমকাইয়া দিতেন, ইনিও তেমনই কথার পিঠে কথার মিল দিয়া আসরে সকল লোককে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেন; পাঁচালীর ছড়া যেন চঞ্চল শিশুর মত ছুটিয়া চলিত। তাঁহার ছড়া কাটার রীতি এইরূপ ছিল—

পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ম্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী
সতীর ভূষণ পতি।
যোগীর ভূষণ ভস্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্য,
রত্নের ভূষণ জ্যোতিঃ॥

বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল,
জলের ভূষণ পদ্ম।
পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুণগুণ স্বর,
ইত্যাদি—ইত্যাদি।

এইভাবে কাহার ভূষণ কি তাই ক্রমাগত দুই তিন পৃষ্ঠা জুড়িয়া চলিয়াছে। লোকেরা এই আশ্চর্য্য লোকটির ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে। দাশরথী দেব-দেবীর কথা লইয়া পাঁচালীর অনেক পালা রচনা করিয়াছেন, তা'ছাড়া বিধবা-বিবাহ ঠাট্টা করিয়া এবং আর আর সামাজিক কথা লইয়াও কয়েকটি পালা লিখিয়া গিয়াছেন।

দাশরথীর শ্যামা বিষয়ক গানগুলি বড় মধুর। রামপ্রসাদের পরে শাক্ত সঙ্গীত রচকগণের মধ্যে তাঁহার আসন।

যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারী ও কৃষ্ণকমলই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতিলাভ করেন। কৃষ্ণ-কমল গোস্বামীর "স্বপ্ন বিলাস" ও "রাই-উন্মাদিনী"ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ ও রমণী শ্রীকৃষ্ণকমলের কোন না কোন গান জানিত; ইহাঁর বাড়ী ছিল নদীয়া জেলার ভাজনঘাটে, কিন্তু ঢাকায় ইহার বিস্তর শিষ্য ছিল, এইজন্য সেই স্থানেই তিনি শেষ জীবন কটাইয়াছিলেন। তাঁহার একটা গান নিম্নে দেওয়া গেল।

"শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে।

যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরি কাঁদে,
জননী 'দে ননী' 'দে ননী' বলে॥

যত কাঁদে বাছা বলি সর-সর,
আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্

(বল্লেম) নাহি অবসর, কেবা দিবে সর,
অম্নি সর্ সর্ বলি ফেলিলাম ঠেলে।

যে চাঁদ নিছনি কত কোটি চাঁদ,
সে কেন কাঁদিবে বলি চাঁদ চাঁদ,
(বল্লেম) চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ
ঐ ছ্যাখ চাঁদ পড়ে তোর চরণ তলে।”

কৃষ্ণকমল যখন পূর্ব্ববঙ্গের লোকের চক্ষে রাত দিন জল শুকাইতে না দিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণ প্রেমে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে গোবিন্দ অধিকারী ও কৃষ্ণলীলার গান রচনা করিয়া অপূর্ব্ব “অনুপ্রাস” অলঙ্কারের ছটায় ও ভক্তিতে সকলকে উন্মত্ত করিয়াছিলেন। এখনও অনেক বৃদ্ধ আছেন যাঁহারা কৃষ্ণকমল ও গোবিন্দ অধিকারী এই দুই কবিকেই দেখিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণের লীলা আবার এক শ্রেণীর কাছে ততটা আদর পাইত না, তাঁহারা চাহিতেন আরও তরল আমোদ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকে গানে গানে নূতন ভাবে রচনা করিয়া গোপাল উড়ের দল খুব নাম ও অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিল। শব্দের লালিত্যে গোপাল উড়ের দলের গান দশরথীকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল গানের নমুনা এইরূপ :—

"গা তোলরে নিশি অবসান।
বাঁশ বনে ডাকে কাক, মালী কাটে কপি শাক
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।"

এ পর্য্যন্ত কবিরা যত গান রচনা করিয়াছেন তাহার প্রায় সবগুলি দেব-দেবীর কথা লইয়া। প্রেমের গান বাঁধিতে হইলে তো রাধাকৃষ্ণের লীলা ছাড়া গতিই ছিল না। কিন্তু রামনিধি গুপ্ত ধর্ম্মের রূপক ছাড়িয়া দিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভালবাসার গান বাঁধিয়া গিয়াছেন। ইহাঁকে লোকে 'নিধুবাবু' বলিয়া জানিত, ইনি অতি প্রধান কবি ছিলেন, ইনি অল্প কথায় মনের এরূপ গূঢ় বেদনা বুঝাইতে পারিতেন যে অপরাপর অনেক কবি বহু পৃষ্ঠা লিখিয়াও তাহা পারিতেন না। ইনি ইং ১৭৪১ সনে চাঁপতা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৪ সনে ৮৭ বৎসরে প্রাণ ত্যাগ করেন। শ্রীধর পাঠক নামক এক কবি এই সময় অনেক গুলি সুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা গদ্য

প্রাচীনকালে অধিকাংশ পুস্তকই পদ্যে রচিত হইত, কিন্তু গদ্যেরও যে কিছু কিছু প্রাচীন নমুনা নাই, তাহা নহে। তোমাদিগকে শূন্য-পুরাণের কথা বলিয়াছি, উহা প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে রামাই পণ্ডিত রচনা করেন, এই পুস্তকে কিছু গদ্যের নমুনা আছে। সে গদ্য এক অদ্ভুত রকমের ভাষায় লিখিত। তারপর ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে কবি চণ্ডীদাস "চৈতন্যপ্রাপ্তি" নামক একখানি গদ্য বই লিখিয়াছিলেন, বইখানি সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত, তাহা 'সহজিয়া' নামক বৈষ্ণবদের এক শ্রেণীর ধর্ম্ম-ব্যাখার পুস্তক। সহজিয়ারা ভিন্ন আর কেহ তাহার অর্থ বুঝিবে না। "রাগ-ময়ী-কণা" নামক বৈষ্ণবদিগের আর একখানি পুস্তক পাওয়া যায়। এই সকল প্রাচীন গদ্যের একটা লক্ষণ এই যে ইহাতে ক্রিয়াপদ খুবই কম থাকিত, এবং কথাগুলি খুবই সরল এবং সংক্ষিপ্ত হইত, কারিকা নামক পুস্তক হইতে একটা উদাহরণ দিতেছি :—

"প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ ও স্পর্শগুণ। এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চগুণে পূর্ব্বরাগের উদয়। পূর্ব্বরাগের মূল দুই। চিত্র দর্শন ও অকস্মাৎ বংশী শ্রবণ।"

প্রাই দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সহজিয়া বৈষ্ণবদের একজন "জ্ঞানাদি-সাধন" নামক একখানি গদ্য পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের ভাষা বেশ সরল—একটা নমুনা দিতেছি :—

"অতএব অজ্ঞানি জনেহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না। এখন তুমি সত্য কহ তুমি অজ্ঞান তুমার ঠাঁই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সত্য কি মিথ্যা। অজ্ঞানী জীবে কহেন আমি অজ্ঞানী কখন ঐ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখের শব্দ আমার কর্ণে শুনি নাই এবং আমার চর্ম্মেতেহ তাহান স্পর্শ পাই নাই এবং আমার চক্ষেতেহ তাহান শরীরে রূপ দেখি নাই এবং আমার জিহ্বাতেহ তাহান প্রসাদের রস পাই নাই এবং আমার নাসিকাতেহ তাহান শরীরের গন্ধ পাই নাই অতএব এখন সত্য বুঝিলাম আমি অজ্ঞানী আমার ঠাঁই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা।"

এই লেখায় 'কমা' 'সেমিকলন' দিলেই এখনকার ভাষার সঙ্গে বিশেষ তফাৎ থাকে না। সেকালে "ও" শব্দের স্থলে "হ"এর ব্যবহার হইত, যথা চর্ম্মেতেহ= চর্ম্মেতেও, চক্ষেতেহ=চক্ষেতেও, ইত্যাদি।

এই সময় রাধাবল্লভ শর্ম্মা নামক এক লেখক স্মৃতি-শাস্ত্রে বাঙ্গলা গদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন,—তাহার ভাষাও বেশ সহজ ও সুন্দর।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজেরা এদেশে আসিয়া বাঙ্গলা ভাষা চর্চ্চা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা এদেশ শাসন করিবেন, দেশীয় লোকদের ভাষা না জানিলে দেশে তাঁহাদের আইন-কানুন চালাইবেন কিরূপে? তখনকার দিনে আজ-কালকার মত তো আর হাটে পথে ইংরেজী জানা বাঙ্গালী পাওয়া যাইত না। সুতরাং সাহেবদের কথা এ দেশী লোককে বুঝাইতে হইলে তাঁহাদের বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে হইত, তাহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এখন ভাষা শিখিতে হইলে দুইটি জিনিষের বিশেষ দরকার,—ভাষার ব্যাকরণ জানা, এবং শব্দার্থ জানা। হ্যালহেড্ নামক একজন ইংরেজ ১৭৭৮ সনে একখানি

বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। উইলকিন্স নামক একজন সাহেব হুগলীতে বাঙ্গলা বই ছাপাইবার জন্য একটি প্রেস স্থাপন করেন ; উইলকিন্স নিজ হাতে কাটিয়া বাঙ্গলার এক শেঠ হরপ প্রস্তুত করেন, এবং বাঙ্গলা হরপ প্রস্তুত করিবার প্রণালী দুই জন দেশী কারিগরকে শিক্ষা দেন। এই দুই কারিগর কর্ম্মকার-জাতীয় সম্পর্কে খুড়ো-ভাইপো ছিলেন—ইহাঁদের নাম পঞ্চানন ও মনোহর।

উইলকিন্স বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন, এবং ফষ্টার নামক আর একজন সাহেব ১৭৯৯ সনে প্রথম বাঙ্গলা অভিধান রচনা করেন।

ইংরেজেরা এইভাবে বাঙ্গলা লিখিবার ব্যবস্থা নিজেরাই করিলেন। এখন তাঁহাদের আর একটা দরকার হইল, তাঁহাদের আইন কানন বাঙ্গলায় বুঝাইয়া না দিলে দেশী লোকেরা তাহা বুঝিবে কিরূপে? এবং তাঁহারাই বা রাজ্য শাসন করিবেন কিরূপে? ফষ্টার সাহেব বাঙ্গলা নিজে শিখিয়া গভর্ণমেণ্টের আইন গুলি বাঙ্গলায় তর্জ্জামা করিয়া ফেলিলেন। এই আইনের অনুবাদের প্রথমখণ্ড ইং১৭৯৩ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল

যাঁহারা রাজ্য শাসন করিবেন, তাঁহাদের প্রয়োজন এইভাবে সিদ্ধ হইল, কিন্তু ইহার মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আসিলেন, তাহাদের দরকার অন্যরূপের হইল। ঠিক যে বৎসর ফষ্টর ইংরেজী আইনের বাঙ্গলা তর্জ্জামা প্রকাশ করিলেন, সেই বৎসর কেরি নামক এক পাদ্রী বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করিলেন। বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের উন্নতির মূলে কেরি সাহেবের অক্লান্ত উদ্যম দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কেরী এ দেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ দেশের লোকদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদের কুসংস্কার দূর করিতে হইবে, তবেই তো তাহারা বাইবেলের উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত হইবে। শুধু ধর্ম্ম-প্রচার ও জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি স্বার্থ-ত্যাগী মহাপুরুষের ন্যায় তাঁহার জীবন নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু কষ্টে শ্রীরামপুরে একটি প্রেস স্থাপন করেন, এই শ্রীরামপুর প্রেস হইতে সেকালের অনেক বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। কেরি সাহেব অনেক গুলি ভাষা শিখিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গলা ভাষায় অনেক

গুলি উৎকৃষ্ট বই লিখিয়া গিয়াছেন। টমসন, মারটিন, মার্সমান প্রভৃতি সহযোগীদের সহায়তায় ইনি বাঙ্গলায় বাইবেল তর্জ্জমা করিয়া শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রকাশিত করেন। ১৮০০ সনে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি মারকুইস অব অয়েলেস্‌লি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। বঙ্গভায়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই কলেজে বিশেষ ব্যবস্থা হয়, এবং কেরি সাহেবকে এই বিভাগের ভার দেওয়া হয়।

এখন কেরি সাহেব জন কতক সংস্কৃত ও ফারসীর পণ্ডিত বাছিয়া তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ছিলেন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার; ইনি মেদনীপুরবাসী ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের চেহারাটা ছিল খুব লম্বা ও মোটা, মার্সমান প্রভৃতি সাহেবেরা মনে করিতেন, মৃত্যুঞ্জয়ের মত পণ্ডিত বিশ্ব জগতে খুবই অল্প ছিল, তাঁহারা তাঁহাকে বাঙ্গালার জনসন বলিয়া মান্য করিতেন। কেরী সাহেব ইহার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শিখিতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আর একজন পণ্ডিত ছিলেন কায়স্থ জাতীয় রামরাম বসু, ইনি প্রথমতঃ টমসন

সাহেবের মুন্সী ছিলেন, তাঁহাকে ফারসী পড়াইতেন। রাম-রাম বসু খৃষ্টান হইবেন বলিয়া পাদ্রীদিগকে খুব আশা ভরসা দিয়া হাতে রাখিয়াছিলেন। ইনি খ্রীষ্টের স্তবস্তুতি এমন কি হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া অনেক ছোট ছোট পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, সেই সকল পাদ্রীরা ছাপাইতেন এবং রামরাম বসু এই উপলক্ষে প্রায়ই তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেন। টমসন নিজে ধার করিয়া রাম বসুকে অনেকবার টাকা দিয়াছেন। কিন্তু রামবসুর খ্রীষ্টান হওয়াটা টাকা আদায়ের একটা চা'ল মাত্র; ঠিক দীক্ষা লওয়ার কথা উঠিলে তিনি মাথা চুলকাইয়া আজ না কাল করিয়া সময় লইতেন। শেষে পাদ্রীরা বুঝিলেন এ সকলই রামবসুর শঠতা মাত্র,তিনি কিছুতেই খ্রীষ্টান হইবেন না। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধেও অনেক ভয়ানক কলঙ্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। রামবসু মৃত্যু পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চাকুরী করিয়াছিলেন। ঐ কলেজে আরও কয়েক জন বাঙ্গলার অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজীবলোচন রায় ও চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রসিদ্ধ। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কতকদিন

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন।

কেরি এই সকল পণ্ডিতকে দিয়া বাঙ্গলা গদ্য পুস্তক রচনা করাইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের জাহাজ ছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকে তাদৃশ সুচক্ষে দেখিতেন না। অথচ বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় বই লিখিতে হইয়াছিল। তাঁহারা নিজেদের অগাধ সংস্কৃত বিদ্যা দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার ক্ষীণ শরীরটা প্রকাণ্ডরূপে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই "পণ্ডিতী বাঙ্গলা" একটা কিম্ভূত-কিমাকার পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নমুনা দেখিলে তোমরা না হাসিয়া থাকিতে পারিবে না। মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের লেখা হইতে কিছু নমুনা দিতেছি :—

"ঈদৃশরূপে জাতমাত্র বালকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তমানা চতুর্ব্ব্যূহরূপা ভাষা অস্মদাদিতে যুগপৎ প্রবর্ত্তমানস্বরূপে যদ্যপি প্রতীয়মানা হউন তথাপি পূর্ব্বোক্ত পরাপশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীরূপ চতুর্ব্ব্যূহ রূপেতেই প্রবর্ত্তমানা হউন।" প্রবোধ চন্দ্রিকা।

এক যুগের সাহিত্য ভরিয়া এই পণ্ডিতী বাঙ্গলা পূর্ণ

রূপে বিরাজ করিয়াছে। যে ভাষা শোনা মাত্র তাহার অর্থ বোঝা যায়, তাহাতো ভাষাই নহে, পণ্ডিত-দের ছিল এই ধারণা, সুতরাং ইঁহাদিগকে বাঙ্গলা লিখিতে দিলে ইঁহারা কালী-কলম লইয়া দস্তুর মত লড়াই করিতে বসিয়া যাইতেন; লেখা মনুষ্য-বুদ্ধির যতটা অগম্য করিতে পারা যায়, তাঁহারা ততটা লেখার গুণ ও সফলতা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু কেরি সাহেব নাছোড়বান্দা ছিলেন—তিনি সাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার বিস্তার করিবেন এই ছিল তাঁহার ইচ্ছা, প্রথম প্রথম পণ্ডিতদের অবোধ্য বাক্যের ছটা দেখিয়া তিনি কতকটা চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু পরেই তিনি বুঝিলেন,সেরূপ ভাষায় কাজ চলিবে না,—তাঁহারা নিজেরা নিজেদের নিকট ঐরূপ ভাষার যতই প্রসংশা করুন না কেন। কেরি সাহেব বলিলেন "তোমরা ঘরে যেভাবে কথা বল, সেইভাবে বই লিখিতে হইবে।" সেকেলে পণ্ডিতের পক্ষে ইহার অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? চাষারা ও মেয়েরা যে ভাষায় কথা বলে তাহা ত ইতরের ভাষা—উহা ঘৃণিত প্রাকৃত। ঐ ভাষায় লিখিতে তাঁহারা সহজে রাজি হন নাই। কিন্তু

দানা পানি যে যোগায় তাহার কথা না রাখিলে চলিবে কিসে? সুতরাং বাধ্য হইয়া মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মাকে ঐ চলিত কথায়ই বই লিখিতে হইল। তাঁহার 'প্রবোধ চন্দ্রিকায়' ঐ দুই রকমের ভাষাই আছে, প্রথম দিক্‌টা পণ্ডিতী বাঙ্গলায় ও শেষের দিকটা চলিত বাঙ্গলায় লিখিত হইয়াছে। তাঁহার চলিত বাঙ্গলার একটু নমুনা দিতেছি।

"এক অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুরালয় গমন করত মাঠের মধ্যে এক গোপালকে কহিলেন হে গোপ, আমি অন্ধ তুমি আমাকে আমার শ্বশুরের ঘরে লইয়া যাও। গোপ কহিলেক আমি অনেকের গরু চরাই তোমাকে তোমার শ্বশুর বাড়ী লইয়া গেলে গরু সব কে কেমনে যাবে অতএব আমার যাওয়া হয় না। তোমার শ্বশুরের গরু এইটি অতি সুশীলা ইহার লাঙ্গুল ধরিয়া তুমি যাও এ যে ঘরে প্রবিষ্ট হইবে তোমার শ্বশুর বাড়ী সেই।"

মৃত্যুঞ্জয় ইহা হইতেও বেশী রকমের পাড়াগেঁয়ে কথায় বই লিখিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি রুচি-সঙ্গত নয় বলিয়া এখানে তুলিয়া দেখাইলাম না।

প্রবোধ-চন্দ্রিকা ছাড়াও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের

আরও কতকগুলি বই আছে। তাহার মধ্যে হিতোপ-দেশের বাঙ্গলা অনুবাদ ও রাজাবলী প্রধান। এই সকল পুস্তকের ভাষা ক্রমেই সহজ হইয়া আসিয়াছে।

অতিরিক্ত সংস্কৃতের প্রভাবে বাঙ্গলার কতটা দুর্গতি হইতেছিল, তাহার নমুনা দিয়াছি, ফারসীর হাতেও বঙ্গভাষার কপালে অনেক বিড়ম্বনা পাইতে হইয়াছিল, এখন তাহা বলিব।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাঙ্গলা পড়াইবার ভার লইয়াছিলেন সংস্কৃতের পণ্ডিত, যথা মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, ফারসীর পণ্ডিত যথা রামরাম বসু এবং ইংরেজীর পণ্ডিত যথা কেরি, প্রভৃতি। এই তিন দলের লোকের দ্বারাই বাঙ্গলা ভাষা যেরূপ উপকৃত হইয়াছেন, তেমনই কতকটা লাঞ্ছিতও হইয়াছেন। সংস্কৃতের প্রভাবে বাঙ্গলা কিরূপ অদ্ভুত হইয়াছিল, তাহার নমুনা দিয়াছি, এখন ফারসীর প্রভাবটায় আবার আমাদের ভাষাটি কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহাও দেখিবার বটে। রাম-রাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র হইতে কিছু নমুনা দিতেছি ;—

রাজা তোড়ল দুই লক্ষ সেনার উপর সেনাপতি

প্রবল পরাক্রমে হেঁন্দুস্থান হইতে বাহির হইয়া ক্রমে ক্রমে ৮ মাসে বাণারসের সরহর্দ্দে যে স্থানে দাউদের সেনার মুরচাবন্দি পৌঁছিলেন এ সম্বাদ পূর্ব্বে ওকিল হেঁন্দুস্থান হইতে দাউদকে লিখিয়াছে তাহাতেই দাউদ আপনার দরবস্ত সেনাগণ উত্তর পশ্চিমভাগে পাঠাইয়া স্থানে স্থানে মুরচাবন্দি করিয়া সতত সাবধানে রহিয়াছে।”

মৌলভিরা আবার ইহা হইতেও উৎকট বাঙ্গালা লিখিতে লাগিলেন যথা “বাদসা ও উজির ফয়জন্দের মুখ দেখিয়া খুসির মজলেছ করে।”

ইংরেজদের হাতেও বাঙ্গলার কম দুর্গতি হয় নাই, তাহারও দুই এক নমুনা দিতেছি—

১। “প্রথমেতে বক্র ছিলেন যে ব্যাকেট তিনিও শেষে স্বাক্ষর করিলেন।”

২। “যিনি ইতর লোকের দ্বারা দোষী হইয়া ক্রুশেতে হত হইলেন এমন যে খ্রীষ্ট তত্তুল্য আপনাকে করিলেন।”

৩। “তিনি সকল কর্ম্মে এই মত যথার্থিক ছিলেন যে তিনি যাথার্থের উপাধিতে খ্যাত হইলেন।”

এই গুলি ইংরেজদের বাঙ্গলা লেখা।

ইংরেজেরা বাঙ্গলা নিজে শিখিয়া আশ্চর্য্য উৎসাহের সহিত বাঙ্গলা বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কেরি রাজীব লোচন পণ্ডিতকে দিয়া "কৃষ্ণ-চন্দ্র-চরিত" লিখাইলেন। চণ্ডীচরণ মুন্সীকে "তোতার ইতিহাস" লিখিতে নিযুক্ত করিলেন—এবং গোলকনাথ শর্ম্মাকে দিয়া "হিতোপদেশের" বাঙ্গলা তর্জ্জামা করাইলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার উৎসাহে ও দৃষ্টান্তে বহু ইংরেজ লেখক সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গলা বই লিখিয়া গিয়াছেন। যদিও সাহেব-দের রচনায় বাঙ্গলায় ভুল ও উৎকট রকমের শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, তথাপি ইঁহারাই বাঙ্গলা জন-সাধারণের ঘরে ঘরে জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়াছিলেন। যাঁহারা বাসুকীর মাথা নাড়াতে কিম্বা দিক্‌হস্তীর হাঁচিতে ভূমিকম্প হয়, এই সিদ্ধান্ত করিয়া চুপ হইয়া বসিয়া-ছিল, তাহারা সাহেবদের কৃপায় পদার্থ বিদ্যার তত্ত্ব শিখিয়া লইল। যাহারা শুভঙ্করীর আর্য্যাই গণিতের চূড়ান্ত কথা জানিয়া উক্ত বিদ্যাকে গুরুমহাশয়ের পাঠ-শালার উপরে আর উঠিতে দেয় নাই, তাহারা জ্যামিতি

ও বীজগণিতের মর্ম্ম উদ্ধার করিতে শিখিল। অবশ্য প্রাচীন ভারতে এ সকল জ্ঞান যথেষ্ট ছিল, কিন্তু মধ্য-যুগে জনসাধারণ সে সমস্তই ভুলিয়া গিয়া দিদিমার কওয়া গল্পে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল। তাহারা আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে কত কি আজগুবী গল্প বলিয়া বাঙ্গলার শিশুদিগের জ্ঞানের পথ কাঁটা বন দিয়া আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। বাঙ্গলার সাধারণের ছেলেরা জানিত, চাঁদের মধ্যে যে কালো কালো দাগ দেখা যায়, উহা একটা বুড়ী,—চরকায় বসিয়া সুতা কাটি-তেছে। তাহারা শিখিত, হনুমান সূর্য্যমণ্ডলটাকে কাঁখে করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এবং ব্রহ্ম শাপে সমুদ্রের জল লোনা হইয়া গিয়াছিল। এই কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকার হইতে ইংরেজ পাদ্রিরাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গার জন-সাধারণকে মুক্তি দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,তিনি বাঙ্গালীকে বাঙ্গলা লিখিতে শিখাইলেন; তিনি তাঁহার সহযোগী পাদ্রী এবং অপরাপর সাহেব-দিগকে দিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বই লিখাইলেন।

কেরির বাঙ্গালা লেখা সেকেলে অনেকের বাঙ্গালা

হইতে ভালো। আমরা তাঁহার ইতিহাস-মালা হইতে একটা লেখা তুলিয়া দেখাইতেছি।

"ধনপতি নামে এক সওদাগর লহনা নামে তাহার স্ত্রী। সে লহনাকে বিবাহ করিলে অনেক দিবস সন্তান জন্মিল না অতএব তাহাকে বন্ধ্যা জ্ঞান করিয়া সওদাগর পুনরায় লক্ষপতি সওদাগরের কন্যা খুল্লনা জগন্মোহিনী পরম সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া আপন গৃহে আনিল। ধনপতি কিছুদিনের পরে বাণিজ্যে গেলে, সে সওদাগরের ঘরে দোবলা নামে এক দাসী থাকে, সে লহনাকে কহিল,—"তুমি এখন যৌবনহীনা ও বয়োধিকা খুল্লনা পরম সুন্দরী তাহার রূপ-লাবণ্যে সওদাগর বশ হইবে তোমাকে চাহিবে না। অতএব খুল্লনাকে অন্ন কষ্ট দাও তাহার যৌবন নষ্ট কর।

লহনা দোবলার কথা শুনিয়া মনে বুঝিল দোবলা ভাল বলিয়াছে। পরে লহনা ধনপতি সওদাগরের জবানী কপট পত্র রচনা করিল। সে পত্রে এই লহনাকে লিখিল —

'আমি যে কন্যা বিবাহ করিয়াছি সে রাক্ষসী তাহাকে বিবাহ করিয়া বড় কষ্ট পাইলাম অতএব

দিবা তারে অন্নকষ্ট করিবা যৌবন নষ্ট রাখাইবা তাহারে ছাগল।

এই পত্র শুনিয়া খুল্লনা জ্বলিয়া গেল। দুই সতীনে গালাগালি মুখোমুখি তারপর ধরাধরি চুলাচুলি তারপর কিলাকিলি হইসে বলেতে লহনা খুল্লনার সকল অলঙ্কার ও উত্তম বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ছিড়া কাণি পরাইয়া ছাগল রক্ষণে নিযুক্ত করিল।” ১১২ নং গল্প ২৪১-২৪২ পৃষ্ঠা, ইতিহাস মালা।

কেরি সাহেব ‘কথোপকথন’, ‘বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ’ প্রভৃতি আরও অনেকগুলি পুস্তক এই দেশের ভাষার রচনা করিয়াছেন।

কেরির পরে সাহেবদের মধ্যে যাহারা বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মার্শমানের লেখা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। কিন্তু ফোর্টউইলিয়াম যুগের তিনখানি বাঙ্গালা গদ্য বই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দোষে গুণে মৃত্যুঞ্জয়ের “প্রবোধ-চন্দ্রিকা” সে আমলের একটা বড় কীর্ত্তি। ইহার একদিকে পণ্ডিতী বাঙ্গালার ঘটা—যেন আষাঢ়ে ঘন মেঘের মত জমিয়া সাহিত্যাকাশের একটা দিক আঁধার করিয়া রাখিয়াছে, আর একদিকে চলিত

কথায়—গ্রাম্য ঠাট্টা ও রসিকতায় যেন স্রোতের জলের উপর সূর্য্যের কিরণ চিক্‌চিক্‌ করিতেছে।

দ্বিতীয়খানি প্রতাপাদিত্য চরিত। যাহারা বাঙ্গালার ছোট্ট ডিঙ্গিখানির উপর চল্লিশ মন সংস্কৃত শব্দের গুরু বোঝা চাপাইয়া দিয়াছিলেন, সেই পণ্ডিতের দল তাঁহাদের নিজেদের কু-কীর্ত্তিতে লজ্জিত না হইয়া রাম-বসুর প্রতাপাদিত্য চরিতের যে কিছু ফারসী শব্দ আছে, তাহা লইয়া অনেক বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলা উচিত প্রতাপাদিত্য রাজার ইতিহাস একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক, এই পুস্তকে এমনই সুন্দর করিয়া লেখা হইয়াছে, যে ঘটনাগুলি যেন চোখের সম্মুখে ঘটিতেছে এইরূপ মনে হইবে।

কিন্তু এই দুইখানি পুস্তক হইতে রাজীবলোচনের "কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত" ভাষা হিসাবে উৎকৃষ্ট। ইহাতে সংস্কৃত ও ফারসী এই দুয়েরই অত্যাচার কম, ইহার ভাষা বেশ সহজ সুন্দর, অথচ গ্রাম্য ভাঁড়ামিও নিতান্ত অরুচিকর চলিত কথা ইহাতে নাই। ইংরেজেরা কি সূত্রে বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এই পুস্তকখানিতে একখানি ছবির মত স্পষ্টভাবে

দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর-সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ ভাষায় বাঙ্গালা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, রাজীবলোচন সেই ভাষার পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সাহেব ও বাঙ্গালী একত্র হইয়া বঙ্গ-ভারতীর সেবা করিয়াছিলেন। সাহেবদের নিকট হাতে-খড়ি পাইয়া বাঙ্গালীরা নানাভাবে, নানা বিষয়ে বাঙ্গালা পুস্তক লিখিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র-লালের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এবং কে, এম, ব্যানার্জ্জির "বিদ্যাকল্পদ্রুম" প্রকাশিত হইল। স্কুলের বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক যখন বাঙ্গালীরা নিজেই লিখিতে সুরু করিলেন, তখন ইংরেজ গুরুগণ এই ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গেলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাহিরে—গ্রাম্য ভাষায় ঠাট্টা বিদ্রূপে আসর জমাইয়া, প্রমথ নাথ শর্ম্মা নামক একজন লেখক খুব জোরের সহিত গল্প লিখিতেছিলেন। ইংরাজী ১৮২৩ সালে তাঁহার "বাবু-বিলাস" নামক অপূর্ব্ব গল্পের বই প্রকাশিত হয়। তোমরা এই পুস্তক পড়িলে হাসিয়া হাসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, বাবুর ছেলেরা পাঠশালার গুরুমহাশয়ের কাছে বাঙ্গালা

কিরূপ শিখিয়াছিল, তারপর মুন্সীর কাছে ফারসীর কিরূপ পাঠ পাইয়াছিল এবং শেষে এন্ড্রু, পিড্রু, ডিক্রুশ প্রভৃতি সাহেবদের ইংরেজী বুলী কি ভাবে আওড়াইয়াছিল, এই সকল বিবরণ কৌতুকের সমুদ্র-বিশেষ। প্রথম শর্ম্মা "বাবু-বিলাসের" পরে "বিবি-বিলাস" নামে একখানি বই লেখেন। প্রথম পুস্তকে যেরূপ ধনবানদিগের আদর পাওয়া—বানর ছেলেগুলির উপর কষাঘাত দিয়াছেন, দ্বিতীয় বইখানিতে আবার নূতনতন্ত্রের মেয়েদের উপর খুব বিদ্রূপের বাণ মারিয়াছেন। "বাবু-বিলাস" প্রকাশের ত্রিশ বৎসর পরে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় টেকচাঁদ ঠাকুর নাম দিয়া "আলালের ঘরের দুলাল" নামক পুস্তক প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। "আলালের ঘরের দুলাল" নব বাবু-বিলাসের একখানি নকল। বাবু-বিলাসের ঠাট্টাগুলি অতি অল্প কথায় চোখ চোখ বাণের মত তীক্ষ্ণ হইয়াছে, টেকচাঁদ ঠাকুর অনেক সময় কথা ফেনাইয়া বড় করিয়াছেন। সে যাহা হউক টেকচাঁদের রহস্য-ভাণ্ডারও কম নহে, তিনি 'আলালের ঘরের দুলালে' খুব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সাহেবেরা 'আলালের ঘরের দুলালের' অজস্র

প্রশংসা করিয়াছেন, কেহ টেকচাঁদকে ফিল্‌ডিং কেহবা মোলিয়েরের ও ডিকেন্সের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন, সেই প্রশংসা কিছু অন্যায় হয় নাই। কিন্তু এইটি বড় পরিতাপের বিষয় যে তিনি যাঁহার ভাণ্ডার লুটিয়া রত্নরাজি লইয়াছিলেন, তাঁহার নামটি মাত্র উল্লেখ না করিয়া গল্পটি খাঁটি তাঁহারই নিজের লেখা বলিয়া ভূমিকায় আত্ম-গরিমা প্রকাশ করিলেন এবং বঙ্কিম বাবুর মত লেখকেরাও টেকচাঁদকে বাঙ্গালা রহস্য-সাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়া পূজা প্রদান করিলেন। এক সময় বাঙ্গালী "নব বাবু বিলাস" পুস্তক পড়িয়া মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছিল। লং সাহেবের পুস্তক তালিকায় দেখা যায় যে ১৮২৩ হইতে ১৮৫? সাল পর্য্যন্ত এই পুস্তকখানি ঘন ঘন ছাপা হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে এত সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, যে এটি খুব আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইতেছে যাঁহার লেখা এক সময় এতদূর আদৃত হইয়াছিল, তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত এখন বাঙ্গালী মনে রাখেন নাই এবং যিনি তাঁহারই ধন-দৌলতে ধনী হইলেন, তিনি মালিকের নামটি পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেলেন।

বাঙ্গালা পত্রিকার ইতিহাসের গোড়ায়ও মিসনারীদের প্রযত্ন দৃষ্ট হয়। ১৮১৮ সালে "দিগ্দর্শন" নামক মাসিক পত্রিকা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৬ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশ করেন, কিন্তু ১৮১৮ সালে মার্সম্যানের "শ্রীরামপুর-দর্পণ" এই সকল পত্রিকার উপর মাথা জাগাইয়া উঠে। এই অল্প স্থানে বহুসংখ্যক পত্রিকার নাম করিবার দরকার নাই। কিন্তু ১৮১৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের প্রকাশিত 'কৌমুদী' উল্লেখ-যোগ্য, তিনি এই পত্রিকায় সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি নানারূপ সামাজিক সংশোধন-চেষ্টা সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশে একটা বড় রকমের আন্দোলন সুরু করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তর গাহিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়া হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধিরূপে "চন্দ্রিকা" উপস্থিত হন। ১৮২২ সালে ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা তখন সমস্ত বঙ্গদেশের প্রাণের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তখন সহর মফস্বলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল,—কৌমুদী ও চন্দ্রিকার

লড়াই তখনকার বাঙ্গালা পাঠকদের একটা বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। ইহার পরে ঈশ্বর গুপ্ত 'প্রভাকর' পত্রিকায় এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য) 'রসরাজ' আর এক রকমের লড়াই আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার লেখার রুচি এরূপ কদর্য্য ছিল যে লং সাহেব গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন-নিবেদন করিয়া খারাপ লেখার শাসন ও বারণ জন্য আইন করাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লীলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ লেখকেরা বাঙ্গলায় বই লেখা একরূপ ছাড়িয়া দিলেন। আমাদের পক্ষ হইতে এটি বেশ বলা চলে যে তাঁদের আর বাঙ্গলায় বই লিখিবার দরকার হয় নাই, কারণ তাঁহারা ভূগোল গণিত হইতে সুরু করিয়া ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই গদ্যে বই লেখার প্রণালী বাঙ্গালীদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালীরা যখন এই লেখার বিদ্যাটা আয়ত্ত করিয়া লইল, তখন সাহেবেরা আর বাঙ্গলায় বই লিখিতে যাইয়া বাঙ্গালীদের সঙ্গে কি করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন?

১৮২০ হইতে ১৮৩০ সনের মধ্যে যে সকল গদ্য লেখক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়। ইনি ফোর্ট উই-লিয়াম কলেজের সাহেবদের নিকট কোনরূপ ঋণী নহেন। ইনি একাই ‘একশ’ ছিলেন। শুধু বাঙ্গলা দেশে রামমোহন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন না, তখন তাঁহার সম-কক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে আর ছিল না! রাজা রাম-মোহন রায় যখন বিলাতে যান, তখন ইউনিটিরিয়ান সভা তাঁহাকে যেরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহা আমাদের সমস্ত বাঙ্গালী জাতির গৌরব বিষয়। সভা-পতি মহাশয় এই উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, যে “আজ যদি সক্রেটিশ, নিউটন বা মিল্টন সশরীরে আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেন, তাঁহাকে আমরা হৃদয় ঢালিয়া যেরূপ ভক্তি দিতাম, আপনাকে আমরা সেই ভক্তি দিতেছি। যাঁহারা দক্ষিণ গোলার্দ্ধ সন্ধানে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম “গোল্‌ডক্রস” নামক আশ্চর্য্য নক্ষত্র-পুঞ্জ দেখিয়া যেরূপ বিস্ময় ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমরা সেইরূপ আনন্দ ও বিস্ময়সহ আপনাকে ভক্তি দিতেছি।” রামমোহন রায় পৃথিবীর

যত ভাষা জানিতেন—সে সময়ে তত ভাষাবিৎ পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন না। তর্ক-যুদ্ধে প্রশান্তভাবে তিনি জগজ্জয়ী হইয়াছিলেন। এমন কেহ ছিলেন না—যিনি তর্কে তাঁহার নিকট দাঁড়াইতে পারিতেন। সে যেন জাহাজের সঙ্গে ডিঙ্গি নৌকার ঠোকাঠোকি হইত। হিন্দু পণ্ডিত,মুসলমান মৌলভি,পাদ্রীসাহেব এবং বৌদ্ধ শ্রমণ সকলেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তির নিকট হার মানিয়া যাইতেন।

এইরূপ বিদ্বান ও মনস্বী ব্যক্তির বাঙ্গলা লেখা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে তোমাদের কৌতূহল হইতে পারে। হয়ত তোমরা ভাবিয়াছ তিনি বড় শব্দ ও পণ্ডিতী বাঙ্গলা দিয়া সকলকে চমকাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা আদবেই নয়। তাঁহার ভাষা ছিল অতি সরল, এত সোজা যে শিশুরাও তাহা বুঝিতে পারিত। তিনি খুব বড় জিনিষ এমন জলের মতন সোজা কথায় বুঝাইয়া দিতেন, যে যাহা পণ্ডিতেরা বুঝাইতে গেলে তাঁহারা ও পাঠকেরা সকলেই ঘামিয়া যাইতেন, অথচ বোঝানটাই বাকী থাকিয়া যাইত। তিনি সেই ছোট ছোট কথায় যুক্তিগুলি অতি সহজ করিয়া এমন সুন্দর-

ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, যাহার দরুণ অতি জটিল কথাও সরল হইয়া যাইত, বিষয়গুলি যে এত বড় তাহা আর কাহারও মনে হইত না। যাহারা তাঁহাকে গালাগালি করিত, তাহাদের উত্তর দিতে গিয়া তিনি মোটেই রাগিতেন না। শিশু মায়ের কোলে বসিয়া যেমন রাগিয়া হাত পা ছুড়িতে থাকে ও লাথি মারিতেও ত্রুটি করে না, কিন্তু মা তাকে মিষ্টকথা বলিয়া সান্ত্বনা ও উপদেশ দেন, রামমোহন সেই ভাবে পাঠকদিগকে উপদেশ দিতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান-বৃদ্ধ, সমস্ত লোককে তিনি শিশুর মতন মনে করিতেন, রুষ্ট কথার জবাব তিনি তুষ্টভাবে দিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় দুই পক্ষের বাদানুবাদ ছিল খেউড় গাইয়া যে যত গালাগালি দিতে পারিত, তাহারই ততটা বাহাদুরী ছিল। রামমোহন রায় প্রথম দেখাইলেন, সভ্যভাবে, ধীর ও সংযত হইয়া কিরূপে তর্ক করা যায়। তিনি আমাদের ভাষার ধূলি-কাদা আবর্জ্জনা সর্ব্ব প্রথম সাফ্ করেন। এমন কি কেরি সাহেবের বাঙ্গলা পুস্তকেও অনেক কুরুচিপূর্ণ কথা আছে, কিন্তু রামমোহন রায়ের পুস্তকে একটি কথাও তেমন নাই। সে আমলে কবির খেউড়

লোকের রুচিকর ছিল, সেই যুগে রামমোহন লোক রুচি উন্নতপথে ফিরাইয়া লইলেন। তিনি বাঙ্গলা লেখাকে সর্ব্ব প্রথম ভদ্রোচিত মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্য প্রদান করিলেন।

তিনি এত বড় সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন, বেদ বেদান্ত উপনিষদ পুরাণ ছিল তাঁহার জিহ্বাগ্রে, কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালা একেবারেই সংস্কৃত শব্দ বোঝাই ছিল না,—পূর্ব্বে যে পণ্ডিতী বাঙ্গালার কথা বলিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে রাজা রামমোহনের বাঙ্গলা সম্পূর্ণরূপে পৃথক। তিনি সহজ কথায় লিখিতেন, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে কথায় ভাঁড়ামি তাঁহার লেখায় আদৌ ছিল না। বৈষ্ণব 'জ্ঞানাদি সাধনা' পুস্তকের গদ্যের নমুনা আমি এই পুস্তকের ১৮৮ পৃষ্ঠায় দিয়াছি, তাঁহার রচনা কতকটা সেইরূপ ছিল, উহা খাঁটি বাঙ্গলা। রামমোহন রায় যে একখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, তাহা আকারে ছোট হইলেও গুণে বড়। বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে যে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ তফাৎ আছে, বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত রূপ কি, তাহাই রাজা রামমোহন রায় তাঁহার ক্ষুদ্র ব্যাকরণ খানিতে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এখনকার ব্যাকরণ-

কারেরা শুধু সংস্কৃতের সূত্রের বাঙ্গলা তর্জ্জামা করিয়া মনে করিয়া থাকেন, উহাই বাঙ্গলা ব্যাকরণ হইল। রামমোহনের বাঙ্গলার নমুনা কিছু নীচে দেওয়া যাইতেছে :—

১। "চিত্ত শুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্ম জ্ঞানের অধিকার হয়। এই হেতু তখন ব্রহ্ম-বিচারের অধিকার জন্মে। যদি ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন তবে কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্বর বিচার হইতে পারে—এই সন্দেহ পর সূত্রে দূর করিতেছেন। এই বিশ্বের জন্ম-স্থিতি ও নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি-ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য্য কারণ থাকে, কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না।" বেদান্ত সূত্র।

উপরের লেখাটা অতি দুরূহ ধর্ম্ম-বিষয়ক, তথাপি রাজা ব্যাখাটিকে যতদূর সম্ভব সহজ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক সমূহ পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি সরল ভাষায় কিরূপ জোরে মানুষের মর্ম্মস্থলে ঘা দিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গান বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এখনও গাওয়া

হয়। "মনে স্থির করি আছ চির দিন কি সুখে যাবে। জীবন যৌবন ধন সব রবে সমভাবে।" এবং "আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার।" প্রভৃতি গান ব্রহ্ম-সংগীত-মালার পারিজাত পুষ্প।

রামমোহন রায় ইং ১৮৩৩ সনে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিষ্টল নগরে প্রাণত্যাগ করেন। ইনিই বঙ্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

এই যুগের পরে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। সেই যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর,) কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি লেখকগণ বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধন করেন। এই যুগের প্রথম দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় স্বীয় প্রতিভা দ্বারা বঙ্গদেশকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি ১৮১১ ইং সনে কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ইনি তিন বছর বয়সে দুই ছত্র কবিতা মুখে মুখে রচনা করিয়া তাঁহার পিতা হরিমোহন গুপ্তকে চমকাইয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতা-বাসের কষ্ট শিশু এইভাবে বুঝাইয়াছিল—

"রেতে মশা দিনে মাছি।
এই নিয়ে ভাই কলকতায় আছি।"

ঈহার পরিহাস শক্তির প্রশংসা এককালে সকলেরই মুখে মুখে শোনা যাইত। এখনকার দিনে রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহার রসিকতা আর সেরূপ উচ্চ হাস্যের সঙ্গে উপভোগ করিতে পারি না, যেরূপ ভাবে আমাদের ঠাকুরদাদারা করিতেন। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে এখনও সেগুলি নেহাৎ মন্দ মনে হয় না। বিধবা-বিবাহের আইনের সম্বন্ধে ঠাট্টা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

"সকলেই এইভাবে বলাবলি করে।
ছুড়ির কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা॥"

ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকর পত্রিকা এক সময়ে বাঙ্গলা দেশের মুখ পত্র ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত এই দেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে তখন মহারথ ছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার

হাতের পুরস্কার পাইয়া নিজকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। প্রভাকর সম্পাদকের মুখের দুইটি প্রশংসার কথা শুনিবার জন্য তখন বড় বড় লেখক লালায়িত থাকিতেন। তাহার পর রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান কবি হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যাকাশের তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার "পদ্মিনী উপাখ্যান" "কর্ম্মদেবী" "শূর-সুন্দরী" প্রভৃতি কাব্য বঙ্গীয় ভারতীর হস্তের কঙ্কণ ও কর্ণের কুণ্ডল বলিয়া পাঠকগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ শুকতারা প্রভাহীন হইয়া যায়, মাইকলর মধুসূদনের আবির্ভাবে রঙ্গলাল সেইরূপ হতশ্রী হইয়া পড়িলেন। এই অর্দ্ধশত বৎসরের মধ্যে সাহিত্য-গগনে কত গ্রহ নক্ষত্রের উদয়াস্ত হইল। যখন যিনি হইয়াছেন, তখন লোকেরা মনে করিয়াছে সে রকমটি আর হয় নাই, হইবে না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ১৬ বৎসর বয়সের সময় লিখিয়াছিলেন যে সেই সময় মাইকেলের গোড়া এরূপ সকল পাঠক ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলিলে ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া যাইতেন।

গ্রাম্য-ভাষা ও সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য এই দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে পড়িয়া বঙ্গভাষা তখনও একটা স্থির মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে নাই। কেহ কেহ এই ভাষাকে টানিয়া লইয়া একেবারে বেহদ্দ সহরের অলিগলিতে ফেলিয়াছেন। যথা, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার "হুতুম প্যাচার নক্সায়"—আবার কেহবা উহাকে অতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দের ঘটায় গজেন্দ্র-গামিনী করিয়া তুলিয়াছেন যথা,—তারাসুন্দর তাঁহার "কাদম্বরীতে"। আবার কেহ কেহবা এই দুই স্রোতের মধ্যে ফেলিয়া বাঙ্গালা-ভাষাকে দুই বিরুদ্ধদিকে টানিয়া বিড়ম্বিত করিয়াছেন। ঘূর্ণিপাকে টলমল ডিঙ্গি নৌকার ন্যায় তখন ইহার অবস্থাটি হইয়াছে—যেমন রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন-কুল সর্ব্বস্ব" নাটকে।

এই সন্ধিস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রতিভার স্নিগ্ধ, সুন্দর ও অপূর্ব্ব শ্রী লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ইনি সংস্কৃত শব্দ দিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সাজাইলেন, সেই সাজানোটিতেই তাঁহার হাতের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য প্রকাশ পাইল। যে গহনাগুলি ভারি তাহা তিনি ছাড়িয়া দিলেন। সংস্কৃতের ছোট ছোট

সমাস, ছোট ছোট কথা এমনই কৌশলে তিনি বাঙ্গালার গায়ে পরাইয়া দিলেন, যে আমাদের ভাষা সম্পন্ন গৃহস্থের মেয়ের মত বড় সুন্দর দেখাইল,—সেই গয়না অতিরিক্ত ভাবে পরিয়া তাহার চলাফেরার কোন বাধা হইল না। পূর্ব্বের পণ্ডিতদের হাতে গয়না পরিয়া বঙ্গভাষা একেবারে ভারে এলাইয়া পড়িতেন, তাহার উত্থানশক্তি ও গতিশক্তি রহিত হইত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের হাতের সাজান মেয়েটি বেশ ছুটাছুটি করিয়া চলিতে লাগিল। এখনও "সীতার বনবাস" পড়িলে চোখের জল পড়ে, তাহার ভাষা ও ভাব কিছুই পুরাণো হইয়া যায় নাই। এমন কি বঙ্কিমবাবুর ভাষাও কতকটা সেকেলে হইয়া গিয়াছে। দুর্গেশ-নন্দিনী প্রথম প্রকাশের পরে পাঠকবর্গ যেরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস ও চোখের জল দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল, এখন ত সে বই আর তেমন ভাল লাগে না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা ও সীতার বনবাস এখন পড়িলে, এখনই হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যাইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আত্ম-জীবন" ও রাসমণির "জীবনী" এই দুইখানি পুস্তকের ভাষাও পুরাণো হইয়া যায় নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা সর্ব্বত্র পরিচিত তথাপি সামান্ত কিছু নমুনা দিতেছি—

(১) ... এই বলিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিয়া রাজা দেখিতে পাইলেন, তিনটি অল্পবয়স্কা তপস্বীকন্যা অনতি-বৃহৎ সেচন-কলস কক্ষে লইয়া আলবালে জল-সেচন করিতে আসিতেছে। রাজা তাহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—"ইহারা আশ্রমবাসিনী; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম আজ উদ্যানলতা সৌন্দর্য্য-গুণে বনলতার নিকট পরাজিত হইল। এই বলিয়া তরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা নাম্নী দুই সহচরীর সহিত বৃক্ষ বাটিকাতে উপস্থিত হইয়া আলবালে জল-সেচন করিতে লাগিলেন। অনুসূয়া পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন,—"সখি শকুন্তলে! বোধ করি পিতা কণ্ব তোমা অপেক্ষাও আশ্রম-পাদপদিগকে ভালবাসেন। দেখ, তুমি নবমল্লিকা-কুসুমকোমলা তথাপি তোমাকে আলবালে জলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।"

শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—“সখি অনুসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই জলসেচন করিতে আসিয়াছি এমন নয়; আমারও ইহাদের উপর সোদর স্নেহ আছে।”

(২) এই বলিয়া তপোবন তরুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগকে জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি তোমাদের ভূষণ-প্রিয় হইয়াও স্নেহ-বশতঃ কদাচ পল্লব ভাঙ্গিতেন না তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময় যাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন. তোমরা সকলে অনুমতি কর।”

ভাষা ও ভাবে এই সকল লেখা তীর্থ-নীরের ন্যায় পবিত্র।

ইংরাজী লেখার একটা জোর আছে, ভাষাকে বিদেশী ভাষার দ্বারা বিকৃত না করিয়া অক্ষয় দত্ত এই যুগে বাঙ্গালায় সেই জোরটি আনিয়াছিলেন। ইহা পণ্ডিতেরা পারেন নাই। অক্ষয় দত্ত মহাশয় ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হইলে যেরূপ ছন্দে তীব্র

শোকের কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ভাষার সেই জোর স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়—

"বৃষ্টল! বৃষ্টল! তুমি আমাদের কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগের একেবারে অনাথ ও অবসন্ন করিয়া গিয়াছ! * * * * সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের মৃতাশৌচ চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে। সে দিন ভারতরাজ্যের কল্যাণ শিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে। এ দেশীয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমরা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণজিৎ-শূন্য শিখ সৈন্যের অবস্থায় পতিত হইয়াছ।"

এই ছন্দ আমাদের বিলাপময় ভগবানের প্রতি নির্ভরপূর্ণ শ্মশানযাত্রীর শোক-সঙ্গীতের নহে,—ইহা ড্রাম ও বিউগুল বাজাইয়া মৃত যোদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে সকল লোক সমাধিক্ষেত্রে যায়, তাহাদেরই উদ্দীপনাময় গানের ছন্দ। বিলাতের আমদানী হইলেও এই তাল মর্ম্মস্পর্শী; উহা বঙ্গভাষায় বেমানান হয় নাই।

অক্ষয় দত্ত বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিতে যাইয়া অতি

সহজ ভাষার আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার স্বপ্নদর্শন ও বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের ভাষা স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যে কতকটা ঘোরাল হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়ের ভাষা বেশ প্রবাহময়ী।

ইহার পরে দীনবন্ধু, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সে যুগ আসিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আমরা কিছু এই পুস্তকে লিখিব না।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের একটা ধারা ছিল। নব যুগে সেই ধারা থামিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে সকলকে না দিয়া কোন ব্যাপার হইতে পারিত না। আমোদ, আহ্লাদ, উৎসব এ সকলই সার্ব্বজনীন হইত। হরিরলুটের যে ধারা—সকল ব্যাপারেই সেই রীতি ছিল। গৃহস্থ যত দরিদ্র হউক না কেন, সত্য-পীরের সিন্নি হইতে—দুই পয়সার বাতাসা দিয়া হরির-লুট পর্য্যন্ত কোন কার্য্যেই সে দোর আগলাইয়া বাহিরকে ঠেকিয়া রাখে নাই। গরিবেরাও মহোৎসব দিত, তাহাতে ধনী, দরিদ্র, নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত বলিয়া কোন বিচার থাকিত না, যে আসিয়াছে সেই পাত

পাতিয়া বসিয়া যাইত। ধনীর বাড়ীতে পূজা অর্চ্চনায় চাষা ও ভদ্রলোক একত্র হইয়া গান শুনিত, উৎসবে যোগ দিত। জাতিভেদের সহস্র বেড়া ডিঙ্গাইয়া সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃ-ভাব জয় নিশান উড়াইয়া থাকিত ও সকলের বাড়ীতেই একটা মিলনের ক্ষেত্র তৈরী করিয়া লইত।

কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই এই রীতি খাটিত। এমন বিষয়ে কাব্য হইত না যাহার ভাবে সমস্ত জাতি সাড়া দিতে না পারিত। মোট কথা, সকলকে ভিড়াইয়া একখানে আনিয়া শুনাইতে হইবে, এই ছিল সেকালের পদ্ধতি। বিদ্যাসুন্দরের পালা গাও তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু অন্নদা-মঙ্গলের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া লোককে আগে একত্র করিও— তারপর কোন নূতন গল্প থাকে তাহা সুকৌশলে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিও। চণ্ডী-মঙ্গল, রাম মঙ্গল, কৃষ্ণ-মঙ্গল এ সকল সমস্ত জাতির সম্পদ। একা বা কোন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ভোগ করিবার জন্য এ সকল কিছু ছিল না। দেবতাদের কীর্ত্তন করিতে গিয়া কবিরা এমন কথা বলিতেন, যাহা সমস্ত শ্রোতারাই চোখের

জল ফেলিয়া শুনিত। ভগবতীর প্রসঙ্গে মেনকা ও হিমালয়ের কথাবার্ত্তা তো বাস্তবিক বাঙ্গালীর সত্ত বিবাহিতা ছোট মেয়েদের কথা। এত ছোট বয়সে তারা শ্বশুর ঘরে যাইয়া যে কত কষ্টে থাকিত তাহার ইতিহাস ঘরে ঘরে জানা ছিল। তাই আগমনী গানে ঘোমটার নীচে শত শত চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। বৃন্দাবনের নাম করিয়া যে বাঁশের বাঁশী বাজিত, সে তো বাঙ্গালার গোচারণের মাঠের রাখালের সুর, রাম-বনবাসের যে কান্না তাহা তো বাঙ্গালার গোপীচন্দ্র, —বাঙ্গালার চৈতন্য,—বাঙ্গালার রঘুনাথদাস ও নরোত্তমদাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ঘরে ঘরে ছেলেরা সন্ন্যাসী হইত, সুতরাং উত্তর-কোশলের যুবরাজ কবে বনে গিয়াছিলেন তাহা উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীরা ঐ সকল গানে তাদের বাড়ী ঘরের কথাই শুনিত। সকল দেশের লোকেরাই তাহাই করিয়া থাকে—নিজের দেশের—নিজের সমাজের—ধর্ম্মের কথা লইয়াই সর্ব্বদেশে স্থায়ী কাব্য রচিত হইয়া থাকে। কবিরা কল্পনা বলে অনেক নূতন সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু সেগুলি চালচিত্রি মাত্র। মূল কাব্য-রস

স্বীয় সমাজ হইতে আকর্ষণ করিয়া কবি তাঁহার রচনাকে হৃদয়গ্রাহী করেন,—যেরূপ বৃক্ষ নিজের জন্মস্থান হইয়া রস লইয়া ফল-ফুলের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইজন্যই কবিদের গান ও কাব্য দেশময় প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের দেশ এতকাল যে সকল বিষয় লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াছে, এখনও শিক্ষিত বঙ্গের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর বঙ্গে শত শত পল্লীর স্নিগ্ধ ছায়ায় সেই সকল আমোদ চলিতেছে—নূতন জীবনের সাড়া সে সকল স্থানে এখনও পড়ে নাই। সেখানে নহবতের বাদ্য ও উৎসবের গান এখনও পুরাতন হইয়া যায় নাই। নূতন যে শক্তি আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রভাব অস্বীকার করিবার আমাদের উপায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের সমাজে যাহা নাই, আমাদের প্রকৃতি যাহা একেবারে অগ্রাহ্য করে—তাহা লইয়া বিদেশী ভাবে কাব্য-নাটক লিখিলে তাহা স্থায়ীভাবে লোক-প্রশংসার দাবী করিবে কিনা জানি না। এখনকার শিক্ষিতগণের সৃষ্ট-সাহিত্য-রস হইতে বহুলোক বঞ্চিত রহিয়াছে।

উহা আর হরির-লুটের মত নাই, উহা অনেক সময় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহারা সেই রস সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারা হয়ত জাতীয় প্রকৃতিটি ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না, বিদেশী ভাব কি আকারে দেশে আনিলে তাহা সকলেরই হৃদয়-গ্রাহী হইবে, হয়ত তাঁহারা তাহা জানেন না, নতুবা এমনও হইতে পারে যে নব-প্রণালীতে আমাদের লোক এখনও অভ্যস্ত হয় নাই, কিছু কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে সেই নব-শিক্ষার রসধারা ধূর্জ্জটির জটাজাল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সমস্ত জাতির আঙ্গিনার পাশ দিয়া বহিয়া যায় কিনা। বেদান্তের তত্ত্ব হয়ত এককালে ঋষির আশ্রমের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, কালে তাহা নানা ধারায়—পুরাণ ও দর্শনের মধ্য দিয়া জাতীয় নিম্নতমস্তরে ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত দেশকে উন্নত করিয়াছে। সেইভাবে নব্যতন্ত্রের ভাব-গুলি এককালে হয়ত দেশের নিম্নতম সমাজেও অবতরণ করিতে পারে—বিদেশের আদর্শ কতটা থাকিবে, কতটা ধূলিসাৎ হইবে—তাহা জানি না। এই নূতন সাহিত্যে কতটা খাটি জিনিষ আছে তাহা আমরা উত্তেজনার

মধ্যে বাস করিয়া ঠিক বিচার করিতে পারিতেছি না। এই জন্য নিতান্ত আধুনিক সাহিত্যের কথা এই পুস্তকে লিখিতে বিরত রহিলাম। পশ্চিমের রুচি ও ভাব-মূলক সাহিত্যের আদর্শ এ দেশের নিজস্ব করিতে হইলে, আমাদের সকলে মিলিয়া তাঁহাদের জীবনের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে,—ভারতবর্ষ নিজের সভ্যতার আদর্শ ছাড়িয়া দিয়া—তাহা করিবে কিনা জানি না। যদি না করে, তবে এখন যে সকল ভাব শিক্ষিত সমাজকে আনন্দ দিতেছে, তাহার অনেকগুলি ঝরা-ফুলের মত মাটিতে পড়িয়া নষ্ট হইবে। একটু সবুর করিলে কি নষ্ট হবে এবং কি থাকিবে, তাহা বোঝা যাইবে।

সম্পূর্ণ